চার্লস ডারউইন

দ্বাদশ অধ্যায়

জীবের পরিবেশ, বিস্তার ও সংরক্ষণ

(ENVIRONMENT, DISTRIBUTION AND CONSERVATION)

ইউজিন ওডাম

ভূমিকা (Introduction) : বৈচিত্র্যময় এ পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির জীব বসবাস করে। কোনটি স্থলে, কোনটি পানিতে আবার কোনটি বাতাসে। প্রত্যেকটি জীব তার চারপাশের পরিবেশের কতকগুলো উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন জীবজ উপাদান (উদ্ভিদ, প্রাণি, অণুজীব), অজীব উপাদান (পানি, বায়ু, আলো, তাপমাত্রা ইত্যাদি), ভৌত উপাদান (ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা, আর্দ্রতা) ইত্যাদি। প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রত্যেকটি জীব এবং এসব পরিবেশের উপাদানগুলোর সাথে পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক জীবন প্রবাহ সঠিকভাবে অব্যাহত রাখে। পরিবেশের প্রভাবে যেমন জীবের বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে জীবের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে পরিবেশেরও নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। সব জীব যেমন এক রকম নয় তেমনি সব অঞ্চলের পরিবেশও এক রকম নয়। পরিবেশের ধরণ অনুযায়ী সাধারণত জীবের বিস্তার ঘটে থাকে। কতক উদ্ভিদ আছে যা সব জেলাতেই পাওয়া যায় আবার এমন উদ্ভিদও আছে যা কেবল চট্রগ্রাম ও সুন্দরবনে পাওয়া যায়।

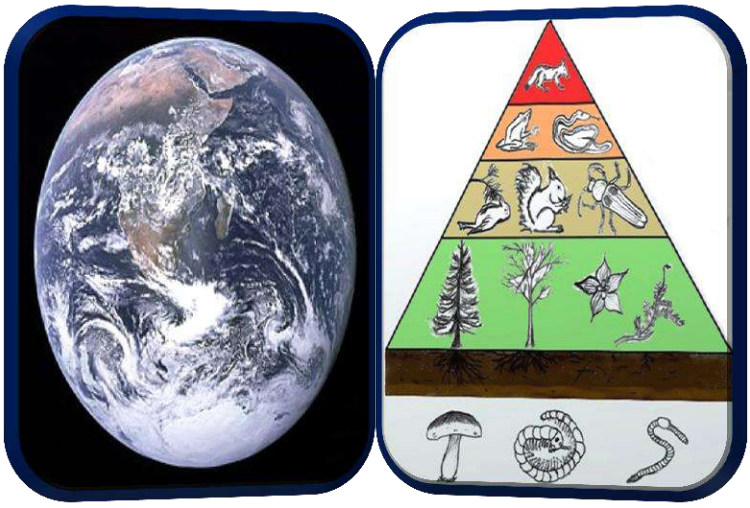

প্রকৃতির প্রধান দুটি উপাদান জীব ও পরিবেশ অত্যন্ত জঠিল ও পরিবর্তনশীল। জীবের সাথে পরিবেশ অতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত, প্রতিক্রিয়াশীল এবং পরস্পর নির্ভরশীল। কোনো স্থানের পরিবেশের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে এবং বিস্তার লাভ করে ঐ স্থানের উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল। প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট কোনো কারণে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটলে জীব সম্প্রদায়ের ওপর এর বিরূপ প্রভাব সৃষ্ট হয় এবং জীবকুল সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। পরিবেশের বিপর্যয়ের ফলে জীবের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃঅঙ্গসংস্থানের কোনো পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো জীব যদি পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে নিজকে খাপ খাইয়ে নিতে হুমকির মুখে পড়ে তখন তাদেরকে সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, আর তা না হলে জীব পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যাবে।। সংকটাপন্ন এ জীবসমুহকে রক্ষা করা মানব সম্প্রদায়ের টিকে থাকার প্রয়োজনেই গুরুত্বপূর্ণ।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা শিখবে (Learning Outcome)	পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan)
১। প্রজাতি, জীবগোষ্ঠী ও জীবসম্প্রদায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।	পাঠ-১ : প্রজাতি ও জীবগোষ্ঠী
২। ইকোলজিক্যাল পিরামিডের প্রকারভেদ চিত্রসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	পাঠ-২ : জীব সম্প্রদায়।
৩। বিভিন্ন প্রকার পিরামিডের মধ্যে তুলনা করতে পারবে।	পাঠ-৩ : বাস্তুতন্ত্র ও ইকোলজিক্যাল পিরামিড।
৪। জলজ, মরুজ ও লবণাক্ত পরিবেশে জীবের অভিযোজন প্রক্রিয়ার তুলনা করতে পারবে।	পাঠ-৪ : জীবের অভিযোজন; জলজ উদ্ভিদের অভিযোজন।
৫। বিভিন্ন ধরনের বায়োম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।	পাঠ-৫ : মরুজ উদ্ভিদের অভিযোজন।
৬। প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলসমুহের ধারনা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	পাঠ-৬ : লোনামাটির উদ্ভিদের অভিযোজন।
৭। ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের প্রাণির বিস্তার বর্ণনা করতে পারবে।	পাঠ-৭ : বায়োম।
৮। বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।	পাঠ-৮ : প্রাণিভূগোল।
৯। বিভিন্ন বনাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ ও প্রাণির নাম উল্লেখ করতে পারবে।	পাঠ-৯ : ওরিয়েন্টাল অঞ্চল।
১০। উপকূলীয় বনাঞ্চল উপযোগী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।	পাঠ-১০ : বাংলাদেশের বনাঞ্চল।
১১। উপকূলীয় এলাকায় বনাঞ্চল তৈরির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	পাঠ-১১ : চিরহরিৎ ও মিশ্রচিরহরিৎ বনাঞ্চল।
১২। বিলুপ্তপ্রায় জীব সম্পর্কে ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	পাঠ-১২ : ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল।
১৩। জীব বিলুপ্তির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	পাঠ-১৩ : উপকূলীয় বনাঞ্চল ও সবুজ বেষ্টনী।
১৪। বিলুপ্তপ্রায় জীব সংরক্ষণের প্রয়োজণীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	পাঠ-১৪ : জীববৈচিত্র্য।
১৫। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।	পাঠ-১৫ : বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় জীব।
১৬। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে।	পাঠ-১৬ : বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা।
১৭। বিলুপ্তপ্রায় জীবের সংরক্ষণের বিষয়ে নিজে সচেতন হবে এবং অন্যদেরও সচেতন করতে পারবে।	পাঠ-১৭ : জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।
	পাঠ-১৮ : ইন-সিটু সংরক্ষণ ও এক্স-সিটু সংরক্ষণ।

প্রধান শব্দ (Key words) : শ্রেণিবিন্যাস (Classification), প্রজাতি (Species), জীবগোষ্ঠী (Population), জীবসমপ্রদায় (community), উৎপাদক (producer), খাদক (consumer), বিয়োজক (decomposer), ইকোলজিক্যাল পিরামিড, বায়োম, এন্ডেমিক জীব, রেড ডাটা বুক (red data book), জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ইন-সিটু সংরক্ষণ, এক্স-সিটু সংরক্ষণ, মৎস্য অভয়াশ্রম, ইকোপার্ক, প্রাণিভূগোল, অভিযোজন, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, সবুজ বেষ্টনী।

প্রজাতি (Species) : গ্রিক শব্দ Specer থেকে (= to look at = appearance) শব্দটি এসেছে। Species-এর বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে প্রজাতি। জীবের আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্যবলির পারস্পপারিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে এদের বিভাগ, শ্রেণি, বর্গ, গোত্র, গণ, প্রজাতি ইত্যাদি গ্রুপ বা স্তরে বিভাজন করার পদ্ধতিকে শ্রেণিবিন্যাস (classification) বলে।

বিজ্ঞানীদের কাছে জীবের পরিচিতি সব সময়ই প্রজাতি নির্ভর। প্রজতি হলো জীবের শ্রেণিবিন্যাসের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম একক। ১৬৮৬ সালে বিজ্ঞানী জন রে (John Ray) সর্বপ্রথম প্রজাতি (species) শব্দটি ব্যবহার করেন। প্রচলিত ধারনার ভিত্তিতে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৮ লক্ষের মতো উদ্ভিদ, প্রাণি ও অণুজীব শনাক্ত হয়েছে। তবে এখনও প্রজাতির ধারনা নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতে **প্রজাতি হলো অভিন্ন পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভুত এবং দৈহিক ও জনন সংক্রান্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ্যে পরস্পর সাদৃশ্য জীবগোষ্ঠী যারা আন্তঃমিলনের মাধ্যমে প্রজননক্ষম (fertile) ও টিকে থাকতে সক্ষম (viable) প্রজন্ম সৃষ্টিতে সামর্থ্য এবং অন্যান্য জীবগোষ্ঠী থেকে জননগতভাবে পৃথক থাকে, তাদের প্রজাতি বলে।**

ICBN স্বীকৃত সর্বনিম্ন স্তর হলো প্রজাতি এবং শ্রেণিবিন্যাসের জন্য এটাকেই মৌলিক স্তর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রজাতির নামকরণের সময় দ্বিপদ নামকরণ প্রথা ব্যবহৃত হয়। যেমন- ধানের বৈজ্ঞানিক নাম *Oryza sativa* L.

প্রজাতি শনাক্তকরণে বৈশিষ্ট্য সমুহ (Characteristics for identification of species) :

প্রজাতিকে সংজ্ঞাবদ্ধ করার বিষয়ে জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও প্রজাতি শনাক্তকরণের জন্য বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সবাই একমত। বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

১। অভিন্ন উৎপত্তি (Identical origin) : একটি প্রজাতির সদস্যদের উৎপত্তি অবশ্যই প্রাকৃতিকভাবে অভিন্ন পূর্বপুরুষ থেকে হবে। বস্তুত তাদের ঐতিহাসিক স্বত্ত্বা (historical entities) থাকবে।

২। সুনির্দিষ্ট ক্ষুদ্রতম জীবগোষ্ঠী (Specific smallest species) : অঙ্গসংস্থানিক ও ক্রোমোজোমীয় বৈশিষ্ট্যের আলোকে এই জীবগোষ্ঠীকে বংশতালিকা বা পেডিগ্রি (pedigre) তে অবশ্যই ক্ষুদ্রতম ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

৩। প্রজননিক সম্প্রদায় (Reproductive community) : প্রজাতি গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যরা শুধু নিজেদের মধ্যে যৌন জননে সক্ষম কিন্তু অন্য এরূপ জনগোষ্ঠী থেকে অবশ্যই পৃথক হবে।

৪। বাস্তুতান্ত্রিক একক (Ecological unit) : বাস্তুতান্ত্রিকভাবে প্রজাতির অন্তভূক্ত সদস্যরা একই পরিবেশে একক জনগোষ্ঠী হিসেবে বাস করে এবং ঐ পরিবেশে বসবাসকারী অন্যান্য জীবগোষ্ঠীর সাথে আন্তঃবিক্রিয়াগতভাবে অবশ্যই পৃথক। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রজাতির সুনির্দিষ্ট বাস্তুতান্ত্রিক নীশ (ecological niche) রয়েছে।

৫। জেনেটিক একক (Genetic unt) : প্রজাতি এমন এক জীবগোষ্ঠী যাদের পারস্পারিক আদান-প্রদাণ যোগ্য এক বিশাল জিন ভান্ডার রয়েছে, তবে তা অন্য জীবগোষ্ঠী থেকে পৃথক।

পৃথিবীতে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা (Number of plant species in the world) : পৃথিবীতে বর্তমান বর্ণনাকৃত (described) ও অনুমিত (estimated) প্রজাতির সংখ্যা নিম্নরূপ (source : Jeffries M.J. 1997 ; Prance G.T. 1992).

ট্যাক্সার নাম	বর্ণনাকৃত প্রজাতির সংখ্যা	অনুমিত প্রজাতির সংখ্যা
ব্যাকটেরিয়া	৪০০০	১০,০০,০০০
ছত্রাক	৭২,০০০	১৫,০০,০০০
শৈবাল	৪০,০০০	২,০০,০০০
লাইকেন	১৩,৫০০	২০,০০০
মস	৮,০০০	৯,০০০
লিভারওর্টস	৬,০০০	৭,০০০
ফার্ণ ও ফার্ণতুল্য	১২,০০০	১২,৫০০
জিমনোস্পার্ম	৬৫০	৬৫০
অ্যানজিওস্পার্ম	২,৫০,০০০	৩,০০,০০০

জন রে (১৬২৭-১৭০৫)

ইংরেজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী জন রে (John Ray) উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও প্রকৃতিতত্ত্বের ওপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংবলিত একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। 'হিস্টেরিয়া প্লান্টেরাম' গ্রন্থে তিনি উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাসের ধারনা দেন, যা আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস তত্ত্বের দ্বার উন্মোচন করে, তিনি সর্বপ্রথম (species) শব্দের সর্বজন গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদাণ করেন।

বাংলাদেশে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা (Number of plant species in Bangladesh) : বাংলাদেশ উদ্ভিদ ও প্রাণি জ্ঞানকোষ অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে বর্ণনাকৃত উদ্ভিদ প্রজাতির (প্রকরণসহ) সংখ্যা নিম্নরূপ :

ব্যাকটেরিয়া - ১৭১, সায়ানোব্যাকটেরিয়া - ৩০০, ছত্রাক - ২৭৫, শৈবাল - ২২৪৫, ব্রায়োফাইটা - ২৪৮, টেরিডোফাইটা-১৯৫, নগ্নবীজী উদ্ভিদ - ০৫, আবৃতবীজী উদ্ভিদ - ৩৬১১। সাম্প্রতিক সময়ে শৈবাল ও আবৃতবীজী উদ্ভিদের আরো কিছু প্রজাতি নথিভুক্ত হরা হয়েছে। কাজেই প্রকৃত সংখ্যা উদ্ধৃত সংখ্যার চেয়ে একটু বেশি হবে।

ভিন্ন প্রজাতির জীবদের মধ্যে বৈচিত্র্যকে প্রজাতিগত বৈচিত্র্য বলে। কখনোই দুটি প্রজাতির জীব একরকম হয় না। জিনগত ভিন্নতার কারণে যখন একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় তখন তাকে জিনগত বৈচিত্র্য বলে। এক্ষেত্রে প্রজাতির রেস (race), জাত (variety) ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। যেমন- বিশ্বের সকল মানুষ *Homo sapiens* এক প্রজাতিভুক্ত হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এর Negroid, Mongoloid, Coucasoid ইত্যাদি রেস দেখা যায়। রেশম পোকা, ধান, গম, ইক্ষু ইত্যাদি জীবের একই প্রজাতিতে একাধিক জাত (varieties) দেখা যায়।

জীবের প্রজাতি শনাক্তকরণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। শ্রেণিবিন্যাসবিদগণ কেবল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই প্রজাতি নির্ণয় করতে চান। এক সময় কেবল বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রজাতি নির্ণয় করা হলেও বর্তমানে প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য, পরাগরেণুর বৈশিষ্ট্য, ক্রোমোজোমাল বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি আমলে নেয়া হয়। বর্তমানে প্রজাতি শনাক্তকরণে আধুনিক জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। প্রজাতি নির্ণয়ে অন্যান্য প্রচলিত শ্রেণিতাত্ত্বিক পদ্ধতির পাশাপাশি বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত হয় DNA বারকোডিং পদ্ধতি।

DNA বারকোডিং পদ্ধতি হলো জীবের DNA এর একটি অংশ হতে জিনের সিকোয়েন্স নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রজাতি শনাক্ত করা। এ পদ্ধতিতে সাধারণত প্রোক্যারিয়টদের ক্ষেত্রে *rRNA* জিন, উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ক্লোরোপ্লাস্টের *matK* ও *rbcl* জিন এবং প্রাণির ক্ষেত্রে মাইটোকন্ড্রিয়াল *COl* জিন ব্যবহৃত হয়।

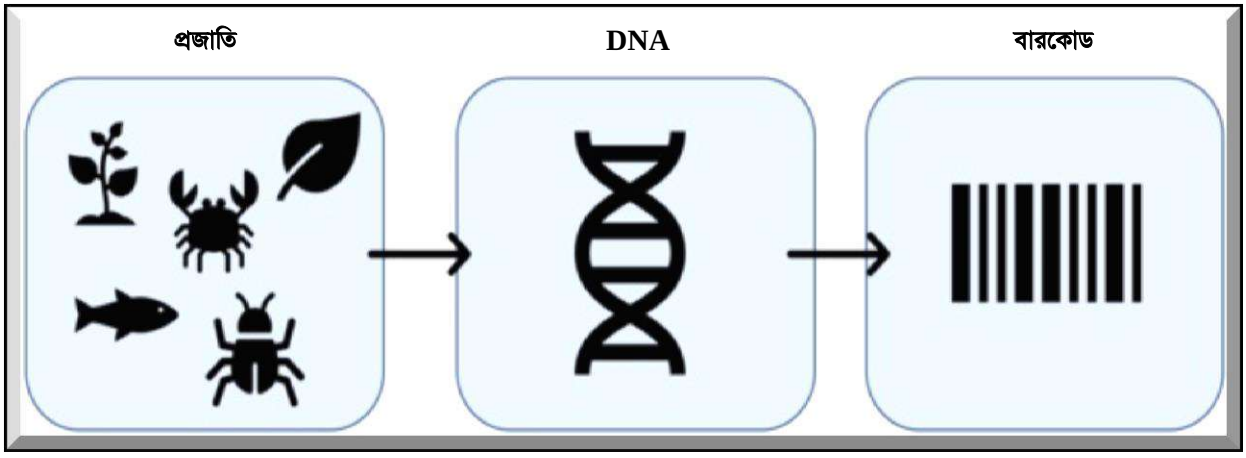

চিত্র : DNA বারকোডিং পদ্ধতি

প্রজাতি নির্ণয়ে বহুল ব্যবহৃত DNA বারকোডিং-এর ক্ষেত্রগুলো হলো-

(ক) যেসব উদ্ভিদের ফুল ও ফল সহজলভ্য নয় তাদের শনাক্ত করা;

(খ) পরাগরেণু শনাক্ত করা;

(গ) পতঙ্গের লার্ভা শনাক্ত করা;

(ঘ) ভিন্ প্রজাতি হিসেবে গণ্য এমন একই প্রজাতির পুরুষ ও স্ত্রী শনাক্ত করা।

প্রজাতিকে জীবের শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির সর্বনিম্ন স্তরে স্থাপন করা হয় অর্থাৎ প্রজাতি হলো শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির সর্বনিম্ন একক। প্রতিটি জীব প্রজাতির একটি সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক নাম থাকে যা দুটি পদের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, যেমন- *Oryza sativa* (ধান), *Gossypium herbaceum* (কার্পাস তুলা), *Artocarpus heterophyllus* (কাঠাল) ইত্যাদি।

ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত দুটি ভিন্ন জীবকে কখন পৃথক প্রজাতিভূক্ত করা হবে? এর মধ্যেও মতের ভিন্নতা রয়েছে। বৈশিষ্ট্যের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে জীব দুটি এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যে পার্থক্যমন্ডিত হতে হবে এবং এই পার্থক্য হতে হবে বিচ্ছিন্ন, এদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা বা মাধ্যমিক পর্যায় থাকলে পৃথক প্রজাতিতে বিভক্ত করা যাবে না।

একটি সহজ উদাহরণ দিলে এটি বুঝতে সুবিধা হবে। বাংলাদেশে পাটের দুটি প্রজাতি চাষ করা হয়। প্রজাতি দুটি হলো *Corchorus capsularis* (সাদা পাট) এবং *Corchorus olitorius* (তোষা পাট)। গঠন বৈশিষ্ট্যে প্রজাতি দুটি অত্যন্ত কাছাকাছি, সাধারণ মানুষ এদের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারবে না। এদের মধ্যকার প্রধান পার্থক্য ফলের আকৃতি ও আকারে।

প্রজাদি দুটির ফলের পার্থক্য বিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ একটির সাথে অপরটি একেবারেই আলাদা। মাধ্যমিক পর্যয়গুলোর অস্তিত্ব থাকলে প্রজাতি দুটিকে আলাদা করা হতো না, দুটি একই প্রজাতির অন্তর্ভূক্ত হতো। যেহেতু এদের মধ্যে কোনো নিরবচ্ছিন্নতা নেই (continuty) সেহেতু প্রজাতি দুটি পৃথক।

জীবের সকল প্রজাতি প্রাকৃতিক পরিবেশের অবিচ্ছিন্ন অংশ দ্বারা বাস্তুতন্ত্রে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। এরা একদিকে যেমন আলোকশক্তিকে ব্যবহার করে জীবজগতের প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থ সরবরাহ করে অন্যদিকে তেমনি জীবের পচন ঘটানো, পরিবেশের গ্যাসীয় ভারসাম্য রক্ষা, ভূমিক্ষয় রোধ কিংবা বালাইদমন, পানি ও পুষ্টি পদার্থ সংরক্ষণ করে প্রকৃতিকে সুস্থিত রাখে।

শিক্ষার্থীর কাজ : অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জলজ, মরুজ ও লবণাক্ত পরিবেশের উদ্ভিদ সংগ্রহ করে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর এবং শিক্ষকের নিকট উপস্থাপন কর।

জীবগোষ্ঠী (Population) : অসংখ্য প্রজাতির জীব নিয়ে এই জীবজগৎ গঠিত। প্রকৃতিতে কোনো জীবই এককভাবে বসবাস করে না বা করতে পারে না। প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যেকেই দলগতভাবে একত্রে বসবাস করে। এভাবে তারা পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে টিকে থাকে এবং প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান এতে সহযোগিতা করে থাকে। এ পৃথিবীতে যে জীবজগৎ গঠিত হয়েছে তা সব অঞ্চলে সমানভাবে বিস্তৃত নয়। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ও প্রভাবকের সাথে আন্তঃক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। সময়ের ব্যবধানে এসব প্রজাতির সংখ্যা ও ধরন পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

একটি নির্দিষ্ট স্থানে একই সময়ে বসবাসকারী একই প্রজাতির একদল জীবকে বলা হয় জীবগোষ্ঠী বা পপুলেশন। যেমন- একই জমিতে আবাদকৃত নির্দিষ্ট ফসল (যেমন- ধান, গম সরিষা ইত্যাদি) বা একটি শালবন ইত্যাদি একেকটি জীবগোষ্ঠী।

জীবগোষ্ঠী সাধারণত দুই ধরনের হয়। যথা-

১। একক প্রজাতির জীবগোষ্ঠী (Single species group) : এ ধরনের জীবগোষ্ঠীতে সাধাণত একটিমাত্র প্রজাতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

২। মিশ্র জীবগোষ্ঠী (Mixed population) : এ ধরনের জীবগোষ্ঠীতে সাধারণত একাধিক প্রজাতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পরিবেশ বিজ্ঞানে মিশ্র জীবগোষ্ঠীকে জীব সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

জীবগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Population) : যেসব বিশেষত্বের জন্য একটি জীবগোষ্ঠী অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র বা আলাদা হয়ে ওঠে তাদেরকে জীবগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচনা করা হয়। উদ্ভিদ জীবগোষ্ঠীর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো-

১। ঘনত্ব ও বিস্তার (Population density & distribution) : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি একক স্থানে বসবাসকারী কোনো প্রজাতির মোট সংখ্যাকে জীবগোষ্ঠীর ঘনত্ব বলে। যেমন- প্রতি হেক্টর জমিতে ৭০০ টি গর্জন গাছ বা প্রতি কিউবিক মিটার মাটিতে ১ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি। জীবগোষ্ঠীর ঘনত্ব সবসময় পরিবর্তনশীল। বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রভাবক দ্বারা এর পরিবর্তন ঘটে। কোনো জীবগোষ্ঠী বন্টনের ভৌগোলিক বিস্তারের সীমাকে বলা হয় ঐ জীবগোষ্ঠীর বিস্তার পরিসর (range)। বিস্তার পরিসরে কোনো প্রজাতির বিস্তার সমপ্রকৃতির (uniform) হতে পারে, অসমপ্রকৃতির (random) হতে পারে, আবার গুচ্ছাকারও (clustered) হতে পারে।

২। জন্ম ও মৃত্যুহার (Birth & death rates) : কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকার জীবগোষ্ঠীর আকার, আয়তন, অবস্থা ও পরিবর্তন তাদের জন্ম-মৃত্যুর হারের ওপর নির্ভর করে। জন্মহার বলতে কোনো জীবগোষ্ঠীতে বার্ষিক নতুন উদ্ভিদ উৎপাদনের শতকরা হার এবং মৃত্যুহার দ্বারা জীবগোষ্ঠীর বার্ষিক মোট মৃত্যু উদ্ভিদের শতকরা হার বুঝানো হয়। জন্ম থেকে মৃত্যুহার কম হলে জীবগোষ্ঠীর বৃদ্ধি ঘটে। আর জন্ম ও মৃত্যুহার সমান হলে জীবগোষ্ঠীর বৃদ্ধি শুন্য হয়।

৩। সংখ্যা বৃদ্ধি (Number increase) : কোনো জীবের সংখ্যাবৃদ্ধি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া এবং কোনো একটি জীবগোষ্ঠীর আয়তন একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপায়ে বৃদ্ধি পায়। সবচেয়ে সুবিধাজনক পরিবেশে কোনো জীবগোষ্ঠী সর্বাধিক কতটা বৃদ্ধি পেতে পারে তাকে বলা হয় প্রচ্ছন্ন সংখ্যাবৃদ্ধি শক্তি। প্রজাতিভেদে একই পরিবেশে জীবগোষ্ঠীর সংখ্যাবৃদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন ২৪ ঘন্টায় কোনো কোনো অণুজীবের সংখ্যাবৃদ্ধি কয়েক লক্ষ থেকে কয়েক কোটি হতে পারে। উচ্চতর জীবের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

৪। সীমিতকরণ (Limitations) : প্রকৃতিই জীবগোষ্ঠীর বৃদ্ধিকে সীমিত রাখে অর্থাৎ পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাবকসমূহ জীবগোষ্ঠীর বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে ঐ জীবগোষ্ঠীর বৃদ্ধি থেমে যায় এবং বৃদ্ধি হারও কমতে থাকে। আবার কোনো একটি জীবগোষ্ঠী অপর একটি জীবগোষ্ঠী দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে। এভাবেই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে।

৫। সাম্যবস্থা (Equilibrium) : একটি জীবগোষ্ঠী বৃদ্ধির সময় প্রথম দিকে দ্রুত বাড়ে। প্রারম্ভিকভাবে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ বৃদ্ধি একই মাত্রায় দীর্ঘকাল ধরে রাখতে জীবগোষ্ঠী সচেষ্ট থাকে। এলাকার বহন ক্ষমতা (carrying capacity) যদি ঠিক থাকে, জীবের জন্য ক্ষতিকারক উপাদান যদি অপসারিত হয় তাহলে জীবগোষ্ঠীর সাম্যবস্থা রক্ষিত হবে। জন্ম ও মৃত্যুহার সমান হবে। এ অবস্থায় জননহার কম-বেশি হতে পারে কিন্তু বৃদ্ধিহার যতদিন পর্যন্ত মৃত্যুহারের সমান থাকবে জীবগোষ্ঠীর সাম্যবস্থাও ততদিন সুরক্ষিত থাকবে।

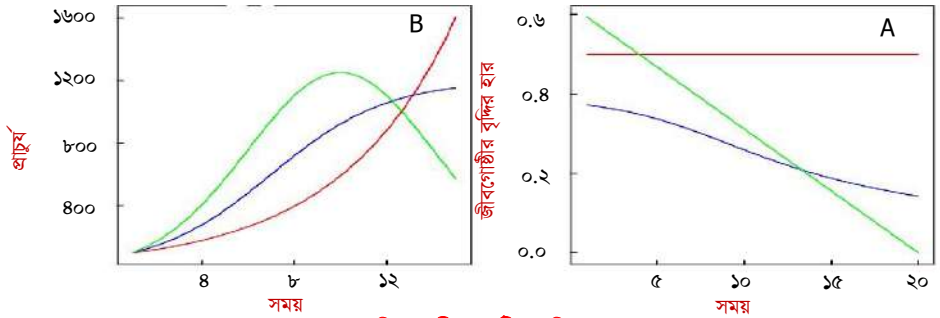

চিত্র : জীবগোষ্ঠীর বৃদ্ধির হার

জীবগোষ্ঠী বন্টনে প্রভাবকসমূহ (Factors influencing the distribution of species) :

১। জলবায়ু (Climate) : তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ুর গতিবেগ, আর্দ্রতা, উজ্জ্বল সূর্যালোক, বাষ্পীভবন ইত্যাদি জীবগোষ্ঠীর সার্বিক গঠনে ভূমিকা পালন করে।

২। মৃত্তিকা (Soil) : মাটির তাপমাত্রা, মাটির আর্দ্রতা, pH, মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমান, মাটিস্থ অণুজীব ইত্যাদি জীবগোষ্ঠী নির্মানে ভূমিকা রাখে।

৩। ভূ-সংস্থান (Geology) : ভূ-পৃষ্টের উচ্চতা, অক্ষাংশ বিভিন্ন অরণ্যের জীবগোষ্ঠী সৃষ্টি করে।

৪। জীবজ প্রভাবক (Biological influencers) : বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণি, অণুজীব, পরজীবী ও পরাশ্রয়ী জীব পরস্পর সহবস্থান করে এবং এদের পারস্পারিক ক্রিয়া নির্দিষ্ট জীবগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখে।

জীবসম্প্রদায় (Biotic Community) : সাধারণত পৃথিবীর কোনো স্থানে বা কোনো পরিবেশই এককভাবে কোনো জীব বা জীবগোষ্ঠী বসবাস করে না বা করতে পারেও না। একমাত্র মানুষের নিয়ন্ত্রিত এলাকা ছাড়া এমন কোনো প্রাকৃতিক আবাসস্থল পাওয়া যাবে না যেখানে শুধু উদ্ভিদ অথবা শুধু প্রাণি বসবাস করে। সাধারণত বিভিন্ন ধরনের জীবসমূহ যেমন- উদ্ভিদ, প্রাণি, অণুজীব একই পরিবেশে একই স্থানে মিলেমিশে বসবাস করে। **জীবসম্প্রদায় হলো একটি নির্দিষ্ট স্থানে এবং একই পরিবেশে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণিসমুহের প্রাকৃতিক সমাবেশ, যারা প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে এক অন্যের প্রতি সহনশীল ও নির্ভরশীল এবং পরস্পর ক্রিয়াশীল।** যেমন- একটি বন, মরুভূমি বা একটি পুকুর হলো প্রাকৃতিক জীবসম্প্রদায়।

Community-এর সংজ্ঞার সাথে তিনটি প্রধান ধারনা জড়িত। যথা-

১। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের একত্রে উপস্থিত থাকা।

২। একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে, একই গ্রুপের প্রজাতিসমুহ একত্রে বারবার উপস্থিত থাকা, যা থেকে community type চেনা যায়।

৩। প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা উদ্ভিদসমুহ (vegetation) যার গতিশীল স্থায়িত্বের দিকে ঝোuকার প্রবণতা রয়েছে।

জীবসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of biotic community) : কোনো জীবসম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্নলেখিত বৈশিষ্ট্যসমুহ দেখা যায়-

১। প্রজাতি বৈচিত্র্যতা (Species diversity) : একটি জীবসম্প্রদায়ে প্রজাতির সংখ্যা (species richness) ও তুলনামূলক প্রাচুর্যকে প্রজাতি বৈচিত্র্যতা বলে। প্রত্যেক জীবসম্প্রদায় বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণি ও অণুজীব নিয়ে গঠিত। এদের সংখ্যা ও অবস্থান সম্প্রদায়ের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে ভিন্নতর হয়। প্রত্যেক জীবসম্প্রদায়ের জীবসমুহ খাদ্য, আশ্রয়, প্রজনন, শারিরীক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে একে অন্যের ওপর এবং জড় পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল হয়।

২। গঠন প্রকৃতি ও কাঠামো (Growth form & structure) : একটি জীবসম্প্রদায়ের প্রধান জীবগোষ্ঠীগুলোকে বিভিন্নভাবে আখ্যায়িত করা হয়; যেমন- শৈবাল, তৃণ, গুল্ম, বৃক্ষ ইত্যাদি। এধরনের প্রত্যেক জীবগোষ্ঠী বিভিন্ন উদ্ভিদ নিয়ে গঠিত। যেমন- বৃক্ষ, এক্ষেত্রে উদ্ভিদগুলো চিরসবুজ, পত্রঝরা, চওড়া প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের হতে পারে।

৩। আধিপত্য (Dominance) : কোনো জীবসম্প্রদায়ের সকল জীব সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। জীবসম্প্রদায়ের প্রকৃতি নির্ণয়ে সম্প্রদায়ভুক্ত সব প্রজাতি সমান ভূমিকা পালন করে না। সম্প্রদায়ভুক্ত বহু প্রজাতির মধ্যে মাত্র কয়েকটি প্রজাতি তাদের সংখ্যা, আকার ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড দ্বারা পুরো সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। মূলত এরাই জীবসম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৪। ক্রমাগমন (Succession) : প্রতিটি জীবসম্প্রদায়ের বিকাশের একটি ইতিহাস থাকে। সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি সাম্যবস্থায় উপনিত হয়। পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে কোনো কোনো জীব প্রজাতির অবলুপ্তি ঘটে আবার কোনো কোনো প্রজাতির আবির্ভাব ঘটে। এভাবে একটি সম্প্রদায় দ্বারা অপর সম্প্রদায়ের প্রতিস্থাপিত হওয়ার প্রক্রিয়কে ক্রমাগমণ বলে।

৫। খাদ্যস্তর গঠন (Tropic level) : একটি সম্প্রদায়ভুক্ত জীবপ্রজাতিসমুহের মধ্যে একটি খাদ্য শৃঙ্খল ও একটি শক্তি প্রবাহ নিশ্চিত হয়। এতে উৎপাদনকারী, তৃণভোজী, মাংসভোজী, পচনকারী সব ধরনের জীব অংশগ্রহণ করে থাকে।

৬। স্তরবিন্যাস (Lebel) : প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থান অনুযায়ী লম্বালম্বি স্তরবিন্যাস থাকে। যেমন একটি বন সম্প্রদায়ে (forest community)।

(ক) ওভারস্টোরি স্তর (Over story level) : সবচেয়ে উচু বৃক্ষগুলো এ স্তর গঠণ করে থাকে এবং অন্যদের উপর ছায়া দিয়ে থাকে। এই স্তরে বসবাসকারী পাখিও ভিন্ন প্রজাতির হয়।

(খ) আন্ডারস্টোরি স্তর (Understory level) : ওভারস্টোরি থেকে অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতার বৃক্ষ প্রজাতিগুলো নিয়ে এই স্তর গঠিত। এরাও তেমন ছায়াপ্রিয় নয়।

(গ) ট্রান্সপ্রোসিভ স্তর (Transpositive level) : ছায়াপ্রিয় উদ্ভিদ প্রজাতিগুলো নিয়ে এই স্তর গঠিত।

(ঘ) চারা স্তর (Seedling level) : বড় বৃক্ষের চারা এবং তৃণজাতীয় উদ্ভিদ নিয়ে এই স্তর গঠিত।

(ঙ) ভূ-সংলগ্ন স্তর (Ground-level) : এই স্তরে প্রচুর হিউমাস থাকে এবং এই স্তরে বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও পোকামাকড় ইত্যাদি থাকে। ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক হলো বিয়োজক অর্থাৎ এরা জৈব বস্তুর পচনে সাহায্য করে।

৭। সময়ের সাথে সম্প্রদায়ের পরিবর্তন (Communities change over time) : সময় ও ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে সম্প্রদায়ভুক্ত জীব প্রজাতিরও পরিবর্তন সাধিত হয়। তাই বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন জীব প্রজাতির সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। শীত, বর্ষা ও বসন্ত ঋতুতে এই পরিবর্তন লক্ষণীয়।

৮। আপেক্ষিক প্রাচুর্যতা (Relative abundance) : জীবসম্প্রদায়ে অবস্থিত বিভিন্ন জীবগোষ্ঠী আপেক্ষিক অনুপাত অনুযায়ী উপস্তিত থাকে, একে আপেক্ষিক প্রাচুর্যতা বলে।

প্রত্যেক জীবসম্প্রদায় কয়েকটি উপাদান নিয়ে গঠিত। যেমন-

(ক) আকার (Size) : জীবসম্প্রদায় ছোট বা বড় আকারের হতে পারে। বড় জীবসম্প্রদায় হচ্ছে বনভূমি, মরুভূমি প্রভৃতি। অপেক্ষাকৃত ছোট জীবসম্প্রদায় হচ্ছে নদী, পাহাড়, পুকুর প্রভৃতি।

(খ) প্রধান প্রজাতি (Dominant species) : জীবসম্প্রদায়ে বসবাসকারী অনেক ধরনের প্রজাতির মধ্যে একটি বা কয়েকটি প্রজাতির সদস্যের প্রাধান্যে জীবসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রাধান্য বিস্তারকারী প্রজাতিগুলোকে ডমিনেন্ট প্রজাতি বলে।

(গ) প্রজাতির সংখ্যা (Number of species) : জীবসম্প্রদায়ের প্রজাতিসমুহের মধ্যে সংখ্যার পার্থক্য হতে পারে। কোথাও শতাধিক প্রজাতির, কোথাও গুটিকয়েক প্রজাতির জীব নিয়ে জীবসম্প্রদায় গঠিত হয়।

(ঘ) বাস্তুসংস্থানিক ব্যাপকতা (Ecological amplitude) : জীবসম্প্রদায়ের গঠন নির্ভর করে বাসস্থানে পরিবেশিক অবস্থার নানামুখী পরিবর্তন এবং প্রজাতির বাস্তুসংস্থানিক ব্যাপকতার উপর।

বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তুসংস্থান |(Ecosystem) : কোনো স্থানের জীব সম্প্রদায় ও এদের পরিবেশ নিজেদের মধ্যে এবং পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার গতিময় পদ্ধতিকে বলা হয় বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তুসংস্থান |(Ecosystem)। বাস্তুতন্ত্র জলজ বা স্থলজ হতে পারে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষ দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে। নিম্নে বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলো আলোচনা করা হলো :

বিজ্ঞানী E.P. Odum ১৯৬৬ সালে কার্যকারিতার দিক দিয়ে বাস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলোকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করেছেন- ১। অজীবজ (abiotic) এবং ২। জীবজ (biotic)। বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানগুলো সম্পর্কে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১। অজীবজ বা নির্জীব উপাদান (Abiotic components) : বাস্তুতন্ত্রের অজীবজ বা নির্জীব উপাদানগুলিকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা হয়, যথা- (ক) অজৈব উপাদান (Inorganic components), (খ) জৈব উপাদান (Organic components) ও (গ) ভৌত উপাদান (Physical components)।

(ক) অজৈব উপাদান (Inorganic components) : বাস্তুতন্ত্রের জৈব-ভূরাসায়নিক চক্রে যারা অংশগ্রহণ করে তাদেরকে অজৈব উপাদান বলে। যেমন- কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, ফসফরাস, সালফার ইত্যাদি।

(খ) জৈব উপাদান (Organic components) : বাস্তুতন্তের যে সমস্ত উপাদানগুলি মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং হিউমাস গঠনে অংশগ্রহণ করে থাকে তাদেরকে জৈব উপাদান বলে। যেমন- মৃত জীবদেহের জৈববস্তু, যথা-কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, নিউক্লিক এসিড ইত্যাদি।

(গ) ভৌত উপাদান (Physical components) : বাস্তুতন্ত্রের যে সকল উপাদান ব্যবহার করে প্রাকৃতিক পরিবেশে জীব তার জীবন ধারণে সক্ষম হয় তাদেরকে ভৌত উপাদান বলে। যেমন- সূর্যালোক, পানি, মাটি, বায়ু, খনিজ উপাদান ইত্যাদি।

২। জীবজ বা সজীব উপাদান (Biotic components) : বাস্তুতন্ত্রের জীবজ বা সজীব উপাদানগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা- (ক) উৎপাদক (Producer), (খ) খাদক (Consumer) ও (গ) বিয়োজক (Decomposer) ।

(ক) উৎপাদক (Producer) : বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত যেসব জীব সূর্যালোকের উপস্থিতিতে পরিবেশ থেকে গৃহীত পানি ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মাধ্যমে শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে তাদেরকে উৎপাদক বলে। সমস্ত সবুজ উদ্ভিদ বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক হিসেবে কাজ করে।

(খ) খাদক (Consumer) : বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত যেসব জীব খাদ্য উৎপাদনে অক্ষম এবং খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদকের উপর নির্ভরশীল, তাদেরকে খাদক বলে। খাদক মূলত চার প্রকার। যথা-

i. **১ম শ্রেণির খাদক (Primary consumer) :** যেসব খাদক সরাসরি উৎপাদকদের ভক্ষণ করে পুষ্টি সম্পন্ন করে অর্থাৎ, খাদ্যের জন্য সম্পূর্ণরূপে উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল, তাদের প্রাথমিক খাদক বলে। এরা মূলত শাকাশী বা তৃণভোজী হয়। যেমন- বিভিন্ন কীটপতঙ্গ, শামুক, ঝিনুক, গরু, ছাগল, খরগোশ প্রভৃতি।

ii. **২য় শ্রেণির খাদক (Secondary consumer) :** যেসব খাদক ১ম শ্রেণির খাদকদের ভক্ষণ করে পুষ্টি গ্রহণ করে, তাদেরকে ২য় শ্রেণির খাদক বলে। যেমন- ব্যাঙ, টিকটিকি, বিড়াল, ছোটপাখি প্রভৃতি।

iii. **৩য় শ্রেণির খাদক (Tertiary consumer) :** যেসব খাদক ২য় শ্রেণির খাদকদের ভক্ষণ করে পুষ্টি গ্রহণ করে, তাদের ৩য় শ্রেণির খাদক বলে। যেমন- বড় মাছ, ময়ূর, বাজপাখি প্রভৃতি।

iv. **সর্বোচ্চ খাদক (Quaternary consumer) :** যেসব মাংসাশী খাদক প্রধানত ৩য় শ্রেণির খাদকদের ভক্ষণ করে পুষ্টি গ্রহণ করে, তাদেরকে সর্বোচ্চ খাদক বলে। যেমন- মানুষ, বাঘ, সিংহ, তিমি প্রভৃতি প্রাণি।

(গ) বিয়োজক (Decomposer) : বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত যেসব অণুজীব জটিল জৈব যৌগগুলি (মৃত উৎপাদক ও খাদকের দেহাংশ) ভেঙ্গে দেয় অর্থাৎ বিয়োজিত করে এবং এই বিয়োজিত পদার্থের কিছু অংশ থেকে এরা পুষ্টি লাভ করে এবং বাকি অংশ অজৈব যৌগে পরিণত করে পরিবেশে মুক্ত করে, এদেরকে সাধারণত বিয়োজক বলে। যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক প্রভৃতি। বাস্তুতন্ত্রের জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্রগুলি পরিচালনায় এরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

উৎপাদক থেকে বিভিন্ন জীবজন্তুর মধ্য দিয়ে খাদ্যশক্তির প্রবাহকে খাদ্য শৃঙ্খল বা ফুড চেইন বলে। ফুড চেইনের বিভিন্ন খাদ্যস্তরকে ট্রফিক লেভেল (trophic level) বলে। প্রকৃতিতে যে কোনো বাস্তুতন্ত্রে একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল পরস্পর যুক্ত থাকে তাকে ফুড ওয়েব (food web) বা খাদ্যজাল বলে।

কয়েকটি খাদ্য শৃঙ্খল (Few food chains) :

পরিবেশ	উৎপাদক	১ম শ্রেণির খাদক	২য় শ্রেণির খাদক	৩য় শ্রেণির খাদক
পুকুর বা বিলের খাদ্য শৃঙ্খল	ফাইটোপ্লাঙ্কটন	জুপ্লাংটন	ছোট মাছ, (মলা, পুটি)	শোল, গজার, বোয়াল
সমুদ্রের খাদ্য শৃঙ্খল	ফাইটোপ্লাঙ্কটন	জুপ্লাংটন	ছোট মাছ, (হেরিং ফিস)	হাঙ্গর
স্থল পরিবেশের খাদ্য শৃঙ্খল	সবুজ উদ্ভিদ	গ্রাসহপার	ব্যাঙ	বাজপাখি

ইকোলজিক্যাল পিরামিড (Ecological Pyramid) : কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশে বায়োটিক কমিউনিটি এবং অজীব উপাদানসমূহ পরস্পরের মিথোস্ক্রিয়ার (interaction) মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে একটি একক তন্ত্র হিসেবে কাজ করে। এ তন্ত্রকে বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম (ecosystem) বলে। ইকোসিস্টেমের জীব ও অজীব উপাদানসমূহ সম্মিলিতভাবে পরিবেশের জীবনপ্রবাহ অক্ষুন্ন রাখে। একটি ইকোসিস্টেমে প্রধানত দুধরনের উপাদান থাকে, যথা- অজীব উপাদান এবং জীব উপাদান।

যে কোনো পরিবেশের খাদ্য শৃঙ্খলে (food chain) কিংবা খাদ্য জালকে (food web) একটি প্রজাতির নির্দিষ্ট অবস্থিতিকে খাদ্যস্তর (trophic level) বলে। খাদ্য শৃঙ্খল কিংবা খাদ্য জালকের প্রথম স্তরে থাকে উৎপাদক, দ্বিতীয় স্তরে ১ম শ্রেণির খাদক (তৃণভোজী), তৃতীয় স্তরে ২য় শ্রেণির খাদক (১ম মাংসাশী), পরবর্তী স্তরে ৩য় শ্রেণির খাদক (২য় মাংসাশী) ইত্যাদি খাদ্য শৃঙ্খলে খাদ্যচক্রের বিভিন্ন খাদ্যস্তরের মধ্যে জীব সম্প্রদায়কে তাদের বিন্যাসের প্রেক্ষিতে একটি বাস্তুতান্ত্রিক ছকে দেখালে তা একটি পিরামিডের আকার ধারণ করে। বিজ্ঞানী Charles Elton ১৯৩৯ সালে সর্বপ্রথম ইকোলজিক্যাল পিরামিড সম্পর্কে ধারনা দেন। তার মতে ইকোসিস্টেমের উৎপাদক থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ খাদক পর্যন্ত জীবের সংখ্যা, ওজন ও স্থিতিশক্তির উপাত্তগুলোকে ছকে স্থাপন করে কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করলে যে পিরামিড আকৃতির চিত্র পাওয়া যায় তাকে ইকোলজিক্যাল পিরামিড বলে।

ইকোলজিক্যাল পিরামিডের প্রকারভেদ (Classification of ecological pyramid) : সাধারণত একটি বাস্তুতন্ত্রে তিন ধরনের পিরামিড দেখতে পাওয়া যায়।

১। সংখ্যার পিরামিড (Pyramid of number) : যে নকশার সাহায্যে কোনো বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন পুষ্টিস্তরের জীবসমুহের সংখ্যাভিত্তিক আন্তঃসম্পর্ক প্রকাশ করে তাকে সংখ্যার পিরামিড বলে। এরকম পিরামিডে ভূমি থেকে শীর্ষ পর্যন্ত ক্রমপর্যায় অনুযায়ী প্রত্যেক পুষ্টিস্তরে জীবের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে যেতে থাকে। শীর্ষ পুষ্টিস্তরগুলোতে প্রাণির সংখ্যা যেমন হ্রাস পায় তেমনি আবার এদের আয়তন তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়। যেমন- একটি তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এখানে উৎপাদক অর্থাৎ ঘাসের পরিমাণ সর্বোচ্চ থাকে। এরপর প্রাথমিক খাদক (তৃণভোজী) যেমন- খরগোশ, ইঁদুর, পাখি এর সংখ্যা কম। পরবর্তীতে দ্বিতীয় খাদক (মাংসাশী) যেমন- হরিণ, সরীসৃপ ইত্যাদি পর্যায়ে এদের সংখ্যা আরও কম এবং সবশেষ শীর্ষ খাদক পর্যায়ে যেমন- বাঘ, ঈগল এদের সংখ্যা সর্বনিম্ন, অন্যদিকে আকার সর্বোচ্চ।

২। জীবভর বা বায়োমাসের পিরামিড (Pyramid of biomass) : জীবজ পদার্থের মোট শুষ্ক ওজনকে বায়োমাস বলে। অনেক সময় ঘন আয়তন বা তাজা ওজন (fresh weight) হিসেবেও বায়োমাস প্রকাশ করা হয়। কোনো বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন পুষ্টিস্তরের সম্পর্ক যখন তাদের জীবন্ত বা শুষ্ক ওজনের উপর ভিত্তি করে পিরামিডের নকশা আকারে উপস্থাপিত হয় তখন তাকে জীবভর বা বায়োমাসের পিরামিড বলে। সংখ্যার পিরামিডের মতো এক্ষেত্রেও জীবভর নিচ থেকে উপরের দিকে কমতে থাকে এবং সর্বোচ্চ খাদক পর্যায়ে ভরের পরিমাণ সবচেয়ে কম। কিন্তু পরজীবী খাদ্যশৃঙ্খলের ক্ষেত্রে এ পিরামিড বিপরীতমুখী হয়। এধরনের পিরামিডের মাধ্যমে খাদ্যশৃঙ্খলে উপস্থিত জীবসমুহের সামগ্রিক ভর পরিমাপ করা যায়।

৩। শক্তির পিরামিড (Pyramid of energy) : খাদ্য শৃঙ্খলে এক পুষ্টি স্তর হতে অন্যস্তরে শক্তি স্থানান্তরের পূর্বে বেশিরভাগ শক্তি তাপ, চলন, বিপাকক্রিয়া, অপাচ্য খাদ্য, মল-মূত্রের আকারে ব্যয় হয় এবং সামান্য পরিমাণ শক্তি (১০%) পরবর্তী পুষ্টি স্তরের খাদকে স্তানান্তরিত হয়। কোনো বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন পুষ্টিস্তরে বিদ্যমান শক্তির পরিমাণ যখন পিরামিডের নকশা আকারে উপস্থাপিত হয় তখন তাকে শক্তির পিরামিড বলা হয়। এক্ষেত্রে পিরামিডের ভূমিতে বিদ্যমান সংগৃহীত মোট শক্তির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী হয়। পরবর্তী পুষ্টিস্তরে বিদ্যমান খাদকের সংগৃহীত শক্তির পরিমাণ উৎপাদকের তুলনায় অনেক কম হয়। এভাবে উৎপাদক থেকে সর্বোচ্চ খাদক পর্যায়ে শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে যার ফলে একটি পিরামিড গঠিত হয়।

বাস্তুসংস্থানিক পিরামিডের তাৎপর্য ও সীমাবদ্ধতা (Significance and limitations of the ecological pyramid) :

তাৎপর্য (Significance) : বাস্তুসংস্থানিক পিরামিড অধ্যায়ন করে- ১। খাদ্যশৃঙ্খলে ট্রফিক স্তরের সংখ্যা সম্পর্কে জানা যায়। ২। প্রতিটি ট্রফিক স্তরে জীবের সংখ্যা ও জীবভর সম্পর্কে ধারনা করা যায়। ৩। ইকোসিস্টেমের প্রকৃতি এবং ট্রফিক স্তরে শক্তির বিস্তার সম্পর্কে ধারনা করা যায়।

সীমাবদ্ধতা (limitations) : ১। বাস্তুসংস্থানিক পিরামিডে বিয়োজকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না যদিও বিশাল পরিমাণের শক্তি এদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। ২। ঋতুগত, দৈনিক এবং বাৎসরিক বিভিন্নতার কোনো উল্লেখ থাকে না। ৩। বহুস্তরে অবস্থানকারী জীবদের সম্পর্কে কোনো প্রতিবিধান নেই। ৪। বাস্তুসংস্থানিক পিরামিড সরল খাদ্য শৃঙ্খলের উপর নির্ভরশীল যা সাধারণত পাওয়া যায় না।

সংখ্যার পিরামিড

বায়োমাস পিরামিড

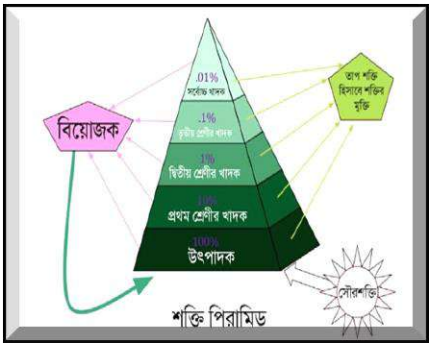

শক্তির পিরামিড

শক্তি প্রবাহ (Energy Flow) : ইকোসিস্টেমের মধ্য দিয়ে সূর্য শক্তির একমুখী চলনকে শক্তি প্রবাহ (energy flow) বলে। সূর্য থেকে যে গতিশক্তি ইকোসিস্টেমে প্রবেশ করে তার একটি অতিক্ষুদ্র অংশ উদ্ভিদ কর্তৃক সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ধৃত হয় এবং গ্লুকোজের মতো বিভিন্ন জৈব অণুতে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে জমা হয়।। কোষীয় শ্বসনের মাধ্যমে জৈব অণুগুলো ভেঙ্গে শক্তি উৎপন্ন হয় যা শরীরে উত্তাপ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে খরচ হয় এবং শেষ পর্যন্ত নিম্নমানের শক্তি হিসেবে পরিবেশে ফিরে যায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে এই শক্তি শুন্যে (space) চলে যায়, জীবজগৎ এ শক্তি পুনরায় ব্যবহার করতে পারে না। কাজেই শক্তি প্রবাহ একমুখী (linear)। শক্তি প্রবাহিত হয় ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে। ইকোসিস্টেমে শক্তি প্রবাহ ঘটে খাদ্য শৃঙ্খলে (food chain)। যে গতিপথে খাদ্য এক স্তর (trophic or feeding level) থেকে পরবর্তী স্তরে স্থানান্তরিত হয় সেই গতিপথকে খাদ্য শৃঙ্খল বা ফুড চেইন (food chain) বলে। খাদ্য শৃঙ্খলে শক্তি পর্যায়ক্রমে খাদ্যের মাধ্যমে এক জীব থেকে অন্য জীবে স্থানান্তরিত হয়। প্রডিউসার বা উৎপাদক সূর্য শক্তিকে গ্রহণ করে খাদ্য শৃঙ্খল তথা ফুড চেইন-এর সূচনা করে। প্রকৃতিতে যে কোনো ইকোসিস্টেমে একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল পরস্পর সংযুক্ত থাকে। পরস্পর একাধিক খাদ্য শৃঙ্খলের জটিল সংযোগ অবস্থাকে ফুড ওয়েব (food web) বলে।

শক্তি প্রবাহের পদ্ধতি (Energy flow system) : বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহ তিনটি পর্যায়ে ঘটে- ১। শক্তির অর্জন, ২। শক্তির ব্যবহার এবং ৩। শক্তির স্থানান্তরণ।

১। শক্তির অর্জন (Acquisition of energy) : বাস্তুতন্ত্রে শক্তির একমাত্র উৎস হলো সূর্য (ব্যতিক্রম কেমোসিন্থেটিক ব্যাকটেরিয়া)। সূর্য থেকে প্রতি বছর ১২।৩ x ১০^{২২} kcal সৌরশক্তি ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। সূর্য থেকে আগত আলোকশক্তির মাত্র ০.০২% সবুজ উদ্ভিদ তাদের সবুজ রঞ্জক কণা ক্লোরোফিলের দ্বারা শোষণ করে। তবে সবুজ উদ্ভিদ এই শোষিত আলোকশক্তির মাত্র ০.১%, সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যের মধ্যে স্থৈতিক শক্তিরূপে আবদ্ধ করতে পারে। এইভাবে একটি বাস্তুতন্ত্রে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে পরিমাণ স্থৈতিকশক্তি উদ্ভিদদেহে আবদ্ধ হয় তাকে মোট বা সার্বিক উৎপাদন (Gross production or GP) বলে।

২। শক্তির ব্যবহার (Use of energy) : সার্বিক উৎপাদিত শক্তির কিছুটা উদ্ভিদের বিপাকীয় কাজে ব্যয়িত হয়। বিপাকীয় কাজে ব্যয়িত শক্তিকে শ্বসন শক্তি (respiration energy বা R) বলে।

মোট বা সার্বিক উৎপাদিত শক্তি (GP) থেকে শ্বসন শক্তি (R) বাদে যে শক্তি উদ্ভিদ তথা উৎপাদকের দেহে সঞ্চিত থাকে, তাকে প্রকৃত উৎপাদন বা নিট উৎপাদন (net production বা NP) বলে। অর্থাৎ বলা যায়, GP – R = NP। প্রতিটি পুষ্টিস্তরেই শক্তির ব্যবহার ও সঞ্চয় হয়ে থাকে। এইভাবে যে শক্তি অর্জিত হয় তাকে মোট বা সার্বিক অর্জিত মক্তি (gross energy intake) বলে।

৩। শক্তির স্থানান্তরণ (Transference of energy) : উৎপাদকের দেহে আবদ্ধ প্রকৃত শক্তি প্রথমে প্রাথমিক খাদক (যেমন- তৃণভোজী প্রাণি) খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করে। প্রাথমিক খাদকের নিজস্ব ব্যবহারের পরে প্রকৃত শক্তি গৌণ খাদকের দেহে খাদ্যের মাধ্যমে স্থনান্তরিত হয়। একইভাবে গৌণ খাদকের দেহ থেকে প্রোগৌণ এবং প্রোগৌণ থেকে সর্বোচ্চ শ্রেণির খাদকে শক্তির স্থানান্তরণ ঘটে। প্রতিক্ষেত্রেই খাদক প্রাণির বিপাকীয় কাজে শ্বসন শক্তি ব্যয়িত হয়। প্রতিক্ষেত্রেই কিছু শক্তির অপচয় ঘটে ও কিছু শক্তি তাপশক্তিরূপে নির্গত হয়। তাই একস্তর থেকে পরবর্তী স্তরে ১০০% শক্তির স্থানান্তরণ কখনও হয় না।

শক্তি প্রবাহের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of energy flow) : ইকোসিস্টেমে শক্তি প্রবাহের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ-

১। শক্তি প্রবাহের মূল উৎস সৌরশক্তি এবং শক্তির প্রবাহ একমুখী।

২। শক্তি প্রবাহের ১০ শতাংশ নিয়ম প্রযোজ্য (Lindemann, 1942) অর্থাৎ ইকোলজিক্যাল পিরামিডের এক পুষ্টি স্তর হতে পরবর্তী পুষ্টিস্তরে মাত্র ১০% শক্তি স্থানান্তরিত হয়

৩। খাদ্যশৃঙ্খলের শুরু থেকে যত শেষের দিকে যাওয়া যায় ততই শক্তির ক্রমব্যয় বা ক্রমহ্রাস ঘটে।

৪। শক্তি প্রবাহে তাপগতির বা থার্মোডিনামিক্স (thermodynamics)-এর ১ম ও ২য় সূত্র পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ কোনো শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না বরং এক শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয় (১ম সূত্র) এবং শক্তির রূপান্তরের সময় কিছু শক্তির অপচয় ঘটে (২য় সূত্র)।

৫। প্রকৃতিতে বিভিন্ন মৌলের (কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি) যেমন চক্রাকার আবর্তন ঘটে, শক্তি তেমনভাবে আবর্তিত হয় না।

জৈবিক বৃহত্তরীকরণ বা বায়োলজিক্যাল ম্যগনিফিকেশন (Biological magnification) : পরিবেশ থেকে জীবদেহে বিষাক্ত পদার্থ গ্রহণ ও জমা হতে পারে। দেহে জমাকৃত বিষাক্ত পদার্থের ঘনত্ব নিম্নস্তরের জীবদের (যেমন- উৎপাদক) তুলনায় পরবর্তী স্তরের জীবদেহে অধিক থাকে। খাদ্য শৃঙ্খলে নিম্নস্তর থেকে উচ্চতর স্তরে অবস্থানরত জীবদেহে বিষের ক্রমবর্ধমান ঘনত্বের এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় বায়োলজিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন (biological magnification)। আমেরিকাতে (১৯৫০ দশকে) ফসলে DDT প্রয়োগের বিষক্রিয়ায় ঈগল (খাদ্য শৃঙ্খলে সর্বোচ্চ স্তরে) প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছিল। পরবর্তীতে সরকার DDT নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

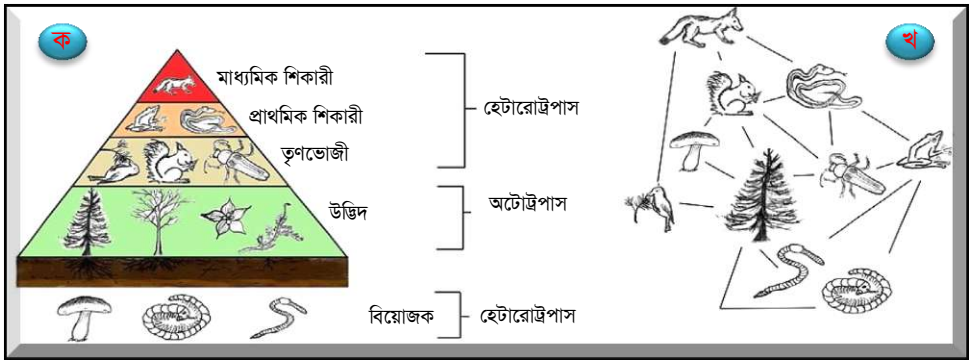

চিত্র : বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ

জীবের অভিযোজন ।(Adaptation of Organism) : পরিবেশের সাথে জীবের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট। সব পরিবেশে সব ধরনের জীব বসবাস করতে পারে না। প্রতিটি জীব তখনই পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে যখন সে তার সুবিধা অনুযায়ী একটি সুন্দর পরিবেশ পায়। পরিবেশ থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে এবং প্রতিকূল পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রতিটি জীব বাহ্যিক, অন্তর্গঠনগত, শারীরবৃত্তীয় ও প্রজননের জন্য কতকগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। **নির্দিষ্ট পরিবেশে সুষ্ঠভাবে বেঁচে থাকা ও বংশবিস্তারের জন্য জীবের যেসব শারীরবৃত্তীয়, অঙ্গসংস্থানিক এবং আচরণগত যে দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে অভিযোজন (adaptation) বলে।**
বিবর্তন, জিন মিউটেশন কিংবা দৈবাৎ পরিবেশ পরিবর্তনে অভিযোজন সুস্পষ্ট দৃশ্যমান হয়। এসব বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় এবং অনেক প্রজন্ম শেষে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের অভিযোজন জীবগোষ্ঠীতে সঞ্চিত হয়ে সুস্পষ্ঠ হয়। এভাবে জীব সম্প্রদায়ে যে অভিযোজন ব্যবস্থা গড়ে উঠে তা থেকে জীব স্বাভাবিক জীবন-যাপনে সর্বোচ্চ সুবিধা আদায়ে এবং প্রতিকূল পরিবেশে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়।

অভিযোজনের প্রকারভেদ (Types of adaptation) : অভিযোজন বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে আলোচিত হলো-

১। মুখ্য অভিযোজন (Primary adaptation) : পূর্বপুরুষ যে পরিবেশে বসবাস করত সেই পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে বর্তমান প্রজন্মের জীবের দেহে যে অভিযোজন হয় তাকে মুখ্য অভিযোজন বলে। যেমন- জলজ উদ্ভিদের অভিযোজন।

২। গৌন অভিযোজন (Secondary adaptation) : পূর্বপুরুষ যে পরিবেশে বসবাস করত সেই পরিবেশ ছেড়ে জীব অন্য পরিবেশে স্থানান্তরিত হলে পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে বর্তমান প্রজন্মের জীবের যেসব অভিযোজন ঘটে, তাদের গৌন অভিযোজন বলে।

৩। অভিসারী অভিযোজন (Convergent adaptation) : যে প্রকার অভিযোজন উৎপত্তি ও গঠণগতভাবে ভিন্ন কিন্তু একই পরিবেশে বসবাসের জন্য বাহ্যিক গঠন ও কার্যগত দিক থেকে এক হয়, তাদের অভিসারী অভিযোজন বলে। যেমন- মৌমাছির হুল এবং কাঁকড়া হুল উৎপত্তি ও গঠণগতভাবে ভিন্ন হলেও এদের বাহ্যিক গঠন ও কার্যকারিতা এক।

৪। অপসারী অভিযোজন (Divergent adaptation) : যে প্রকার অভিযোজনে বিভিন্ন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার জন্য উৎপত্তি ও গঠনগতভাবে একই অঙ্গ বাহ্যিক গঠন ও কার্যগত দিক থেকে আলদা হয়, তাকে অপসারী অভিযোজন বলে। যেমন- তিমির ফ্লিপার বা ডানা ও মানুষের হাত উৎপত্তি ও গঠণগতভাবে এক কিন্তু কার্যগত দিক থেকে আলাদা।

উদ্ভিদের অভিযোজন (Plant adaptation) : আবাসস্থলে পানির উপস্থিতির উপর উদ্ভিদের গঠণ ও প্রকৃতি নির্ভর করে। যেখানে পানির পরিমান সীমিত সেখানে উদ্ভিদের পরিমিত পানি ব্যবহারের কৌশলও রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে উদ্ভিদ পানির প্রাপ্রতা ও ঘাটতি এ দু'টির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। পানির ভারসাম্য রক্ষায় উদ্ভিদের দৈহিক গঠনে নানা বৈচিত্র্য আসে। ১৯০৯ সালে বিজ্ঞানী ওয়ার্মিং মাটির প্রকৃতি এবং মাধ্যমে পানির পরিমানের উপর নির্ভর করে সব উদ্ভিদকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। যথা-
১। জলজ উদ্ভিদ বা হাইড্রোফাইট (Hydrophytes)।
২। মরুজ উদ্ভিদ বা জেরোফাইট (Xerophytes)।
৩। সাধারণ উদ্ভিদ বা মেসোফাইট (Mesophytes)।
৪। লোনামাটির উদ্ভিদ বা হ্যালোফাইট (Halophytes)।

১। জলজ উদ্ভিদ বা হাইড্রোফাইট (Hydrophytes) : Hydrophytes; গ্রিকশব্দ *hydro* = পানি এবং *phyte* = উদ্ভিদ। জলে (পানিতে) যাদের জন্ম তারাই জলজ। যেসব উদ্ভিদ সম্পূর্ণ আর্দ্রস্থান অথবা সম্পূর্ণ বা আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় পানিতে জন্মায় এবং পানিতে বিস্তার লাভ করে তাদেরকে জলজ উদ্ভিদ বলা হয়। জলজ উদ্ভিদের জীবনচক্র সম্পন্ন করতে এরূপ পরিবেশে নিজকে খাপ খাইয়ে নেওয়াকে জলজ অভিযোজন বলা হয়। জলজ উদ্ভিদের কিছু কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরস্পর থেকে পৃথক হলেও অধিকাংশ বাহ্যিক ও অন্তঃস্থ গাঠনিক বৈশিষ্ট্যগুলো মূলত একই রকম।

জলজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of hydrophytes) :
১। নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদের কাণ্ড নরম, দুর্বল, সরু ও লম্বা মধ্যপর্ব বিশিষ্ট হয়। মাটিতে নোঙ্গরাবদ্ধ, ভাসমান উদ্ভিদের কাণ্ড সাধারণত রাইজোম জাতীয় হয়।
২। এদের মূল সুগঠিত হয় না, অনেক ক্ষেত্রে মূল থাকে না বললেই চলে।
৩। কাণ্ড ও পাতার বহিঃত্বক কিউটিনযুক্ত থাকে না; পত্ররন্ধ্র থাকে না বা কম থাকে। পত্ররন্ধে প্রহরী কোষ নাও থাকতে পারে।
৪। এদের মূল ও কান্ডে বড় বড় বায়ুকুঠুরী বিদ্যমান। বায়ুকুঠুরী বিশিষ্ট্য গঠনকে অ্যারেনকাইমা বলে।
৫। এদের পরিবহন কলা অপেক্ষাকৃত ছোট থাকে, অনেক সময় জাইলেম অনুপস্থিত থাকে। মেকানিক্যাল কলা খুবই কম থাকে, তাই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুব বেশী শক্ত হয় না।
৬। অধিকাংশ জলজ উদ্ভিদে অঙ্গজ উপায়ে বংশবৃদ্ধি ঘটে।
৭। পত্ররন্ধ্র কম থাকে বা থাকেই না, পত্ররন্ধ্রে রক্ষীকোষ নাও থাকতে পারে বা নিষ্ক্রিয় হতে পারে।
৮। এদের ভাস্কুলার বান্ডল অপেক্ষাকৃত ছোট। এরা সাধারণত সুবিন্যস্ত নয়। জাইলেমে ট্রাকিড থাকে তবে ভেসেল অনুপস্থিত। অনেক সময় জাইলেম অনুপস্থিত থাকে।
৯। নিমজ্জিত উদ্ভিদের পাতার মেসোফিল কলা পৃথক করা যায় না, ভাসমান উদ্ভিদের পাতায় তা প্যালিসেড ও বায়ুকুঠুরিযুক্ত স্পঞ্জি প্যারেনকাইমায় বিভক্ত।

জলজ উদ্ভিদের প্রকারভেদ (Types of Hydrophytes) : জলজ উদ্ভিদসমূহকে তাদের সঠিক অবস্থা ও অবস্থানের ভিত্তিতে মোট পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-

১। মুক্ত ভাসমান জলজ উদ্ভিদ (Free floating hydrophytes) : যেসব জলজ উদ্ভিদ পানির উপর মুক্ত ভাসমান অবস্থায় জন্মায় এবং পানির স্রোত বা বাতাসের কারণে স্থানান্তরিত হয়, তাদেরকে মুক্ত ভাসমান জলজ উদ্ভিদ বলে। এদের মূল মাটির সংস্পর্শে আসে না বলে কখনও মাটির সাথে আবদ্ধ হতে পারে না। উদ্ভিদজগতের সবচেয়ে ক্ষুদ্র উদ্ভিদ গুড়িপানা (*Wolffia*) এর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও রয়েছে ক্ষুদিপানা (*Lemna*), টোপাপানা (*Pistia*), কচুরীপানা (*Eichhornia*) ইত্যাদি।

২। মূলাবদ্ধ পত্র-ভাসমান জলজ উদ্ভিদ (Rooted floating hydrophytes) : যে সব জলজ উদ্ভিদের মূল জলাশয়ের পানির নিচে মাটিতে সংযুক্ত থাকে কিন্তু দীর্ঘ বোঁটার কারণে পাতাগুলো পানির উপরে ভাসমান থাকে তাদেরকে বলা হয় মূলাবদ্ধ পত্র-ভাসমান জলজ উদ্ভিদ। যেমন- সাদা শাপলা (*Nymphaea pubescens*), লাল শাপলা (*Nymphaea rubra*), পদ্ম (*Nelumbo nucifera*) ইত্যাদি।

৩। মূলাবদ্ধ নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ (Rooted submerged hydrophytes) : যে জলজ উদ্ভিদের দেহ সম্পূর্ণভাবে পানিতে নিমজ্জিত এবং মূলের সাহায্যে মাটির সাথে আবদ্ধ থাকে তাদেরকে মূলাবদ্ধ নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ বলে। যেমন- পানিকলা (*Ottelia alismoides*)।

৪। মুক্ত নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ (Free submerged hydrophytes) : যে জলজ উদ্ভিদের দেহ সম্পূর্ণভাবে পানিতে নিমজ্জিত থাকে কিন্তু মূলের সাহায্যে মাটির সাথে আবদ্ধ থাকে না তাদেরকে মুক্ত নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ বলে। যেমন- ঝাঁঝি (*Ceratophyllum*), নাজা (*Naja*)।

৫। উভচর উদ্ভিদ (Amphibious plants) : এসব উদ্ভিদের কিছু অংশ স্থলে এবং কিছু অংশ পানিতে অবস্থান করে। এরা পানির কিনারায় অথবা অগভীর পানিতে এমনভাবে জন্মায় যে এদের ভূ-নিম্নস্থ অংশ কাদায় বা পানির নিচে থাকে এবং বাকি অংশ পানির উপরে থাকে। উদাহরণ- কলমিলতা (*Ipomoea aquatica*), হেলেঞ্চা (*Enhydra fluctuans*) প্রভৃতি।

জলজ উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptation of hydrophytes) : জলজ উদ্ভিদগুলো নিজেদেরকে পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর জন্য নিম্নলেখিত বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে থাকে।

১। অঙ্গসংস্থানিক অভিযোজন (Morphological adaptation) :

(ক) মূল সুগঠিত হয় না, সংক্ষিপ্ত ও দুর্বল প্রকৃতির হয়। অনেক উদ্ভিদের মূল থাকে না, যেমন- গুড়িপানা।

(খ) মূলে মূলরোম অনুপস্থিত (কারণ পানি শোষণের জন্য মূলরোমের দরকার হয় না)।

(গ) কোনো কোনো উদ্ভিদের অস্থানিক ভাসমান মূল থাকে। ভাসমান মূল উদ্ভিদকে পানিতে ভাসতে সহায়তা হরে, যেমন- কেশরদম।

(ঘ) নিমজ্জিত উদ্ভিদের কাণ্ড নরম ও স্পঞ্জী হয় এবং মধ্যপর্ব লম্বা হয়। ভাসমান উদ্ভিদের কাণ্ড অপেক্ষাকৃত খাটো ও মোটা হয়। মাটিতে আবদ্ধ উদ্ভিদের কাণ্ড রাইজোম জাতীয় ও নরম হয়।

(ঙ) পাতা সাধারণত পাতলা ও নরম থাকে। তাই পানির টানে ছিড়ে যায় না। অনেক উদ্ভিদের পত্রবৃন্ত স্ফীত হয় যা উদ্ভিদকে ভাসতে সাহায্য করে, যেমন- কচুরীপানা।

২। অন্তর্গঠনগত অভিযোজন (Anatomical adaptation) :

(ক) এদের ত্বকে কিউটিকল থাকে না, অথবা খুবই পাতলা থাকে। কারণ পানির অপচয় রোধ করার প্রয়োজন পড়ে না।

(খ) নিমজ্জিত উদ্ভিদের পাতা ও কান্ডের ত্বকে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

(গ) কাণ্ড ও পাতার অভ্যন্তরে বড় বড় বায়ুকুঠুরী বিদ্যমান। বায়ুকুঠুরীগুলো বায়ু ধরে রাখে এবং উদ্ভিদকে ভাসতে সহায়তা করে।

(ঘ) মেকানিক্যাল কলা থাকে না বা কম থাকে। তাই সহজে পানির টানে ভেঙ্গে যায় না।

(ঙ) পরিবহন কলার বিকাশ খুব কম কারণ পানি পরিবহনের প্রয়াজন পড়ে না।

(চ) পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা কম এবং নিমজ্জিত উদ্ভিদে পত্ররন্ধ্র নিষ্ক্রিয় থাকে।

৩। শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন (Physiological adaptation) :

(ক) ত্বকে কিউটিকল না থাকায় সব অঙ্গ দিয়ে পানি শোষণ করতে পারে। পানি শোষণের জন্য মূল ও মূলরোমের প্রয়োজন হয় না।

(খ) কাণ্ড ও পাতার ত্বকেও ক্লোরোফিল থাকে, তাই পানির নিচে কম আলোতে ও কম কার্বন-ডাই-অক্সাইড যুক্ত পরিবেশে প্রয়োজনীয় সালোকসংশ্লেষণ করতে সক্ষম।

(গ) অধিকাংশ জলজ উদ্ভিদ অঙ্গজ উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে থাকে (কারণ পরাগায়ন অনিশ্চিত)।

(ঘ) কাণ্ড ও পাতার বায়ুকুঠুরীতে বাতাস জমা থাকায় শ্বসন ও সালোকসংশ্লেষণের অসুবিধা হয় না।

(ঙ) প্রস্বেদন হার কম কারণ পানি শোষণের জন্য প্রস্বেদনের টান দরকার হয় না।

শাপলা

কচুরীপানা

ক্ষুদিপানা

টোপাপানা

হাইড্রিলা

সেরাটোফাইলাম

পদ্ম

ট্রাপা

কেশরদম

মারসেলিয়া

মরুজ উদ্ভিদ ।(Xerophytes) : যে মাটিতে পানির পরিমাণ খুব কম এবং মাটি কংকর ও বালুময় তাকে মরুজ অঞ্চল বলে। এ সব অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাত সাধারণত ১০ ইঞ্চির কম, তাই মাটিতে পানির পরিমাণও অনেক কম থাকে। মরুজ পরিবেশে যেসব উদ্ভিদ জন্মায় সেসব উদ্ভিদই মরুজ উদ্ভিদ। ওপেনাইমার (Oppenheimer, 1960) মরুজ উদ্ভিদ বলতে সেসব উদ্ভিদকে বুঝিয়েছেন যারা আবাসস্থলে পানির অভাব মেটানোর জন্য নিজেদের বহিঃগঠন, অন্তঃগঠন ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। মরুজ উদ্ভিদকে প্রধানত নিম্নলেখিত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়, যথা :

১। খরা এড়ানো উদ্ভিদ (Drought escaping plants)।
২। কৌশলে খরা এড়ানো উদ্ভিদ (Drought evading plants)।
৩। খরা সহ্যকারী উদ্ভিদ (Drought enduring plants)।
৪। খরা প্রতিরোধকারী উদ্ভিদ (Drought resistant plants)।

মরুজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of xerophytes) :

১। এরা দেহে পানি সংরক্ষণ করতে পারে।
২। অল্প আয়াসে মূল দিয়ে পানি শোষণ করতে পারে।
৩। কাণ্ড ও পাতার মাধ্যমে পানির অপচয় রোধ করতে পারে।

মরুজ উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptation of xerophytes) : মরুজ পরিবেশে নিজেদের টিকে রাখতে এসব উদ্ভিদ গাঠনিক ও শারীরবৃত্তীয় পর্যায়ে বেশ কিছু অভিযোজন প্রদর্শন করে। মরুজ উদ্ভিদের অভিযোজনগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

১। বাহ্যিক অভিযোজন (External adaptation) :

(ক) মরুজ উদ্ভিদসমুহ সাধারণত আকারে ছোট ও ঝোপযুক্ত হয়। এ ধরনের উদ্ভিদ বালি ও বায়ুর ঝাপটা সহ্য করতে পারে, তাই ভেঙ্গে যায় না।

(খ) মূল মাটির উপরিতলের কাছাকাছি অথবা খুবই গভীরে প্রলম্বিত। তাই উপর থেকে সামান্য বৃষ্টির পানি যেমন শোষণ করতে পারে তেমনি দ্রুত মাটির গভীরে চলে যাওয়া পানিও শোষণ করতে পারে। অর্থাৎ এদের মূল সুগঠিত।

(গ) কাণ্ড রোম, মোম বা পুরু বাকল দ্বারা আবৃত তাই প্রস্বেদন হ্রাস পায়।

(ঘ) অনেক উদ্ভিদের পাতা ক্ষুদ্র বা শল্ক জাতীয় বা কাঁটায় রূপান্তরিত অথবা রসালো, তাই পানির অপচয় রোধ হয়। ।

(ঙ) কাণ্ড চ্যাপ্টা, রসালো ও সবুজ থাকে। তাই পানি ধরে রাখতে পারে।

২। অন্তঅঙ্গসংস্থানিক অভিযোজন (Anatomical adaptation) :

(ক) পাতার কিউটিকল পুরু, কান্ডে পানি সঞ্চয়কারী কোষ থাকে।

(খ) এ সমস্ত উদ্ভিদের পাতায় প্যালিসেড প্যারেনকাইমা ঘন ও সদৃঢ়, স্টোম্যাটা ত্বকের গভীরে অবস্থিত, অনেক সময় লম্বা রোম দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। তাই পানি বাস্পায়ন ও নির্গমন কম হয়।

(গ) এদের কান্ডের মেকানিক্যাল কলা ও পরিবহন কলা সুগঠিত, লিগনিনযুক্ত, মোটা প্রাচীরবিশিষ্ট ও ঘন সন্নিবেশিত। এটি পানির অপচয় রোধ করে, পানি ধরে রাখে এবং গাছকে খরা সহিষ্ণু হতে সাহায্য করে।

(ঘ) এদের প্যারেনকাইমা কোষ স্ফীতিশীল ও রসালো। তাই প্রয়োজনীয় পানি ধরে রাখতে পারে।

(ঙ) এপিডার্মিস বহুস্তর বিশিষ্ট এবং অধঃত্বক স্ক্লেরেনকাইমা যুক্ত। তাই এ সমস্ত উদ্ভিদ পানির অপচয় রোধ করে এবং খরায় নেতিয়ে পড়ে না।

৩। শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন (Physiological adaptation) :

(ক) মরুজ উদ্ভিদের অভিস্রবণিক চাপ বেশি। তাই পানি শোষণ মাত্রা বৃদ্ধি পায়। পানি শোষণ সহজ হয়, খরচ কম হয় এবং অপচয় রোধ হয়।

(খ) প্রস্বেদনের হার খুবই কম। তাই শোষিত পানির পরিমাণ কম হলেও তা দেহাভ্যন্তরে ধরে রাখতে পারে।

(গ) বৃষ্টির সাথে সাথে পানি শোষণ করে নিতে সক্ষম। এসব পানি দেহে সঞ্চিত হয়।

(ঘ) বর্ষজীবী উদ্ভিদসমুহ বৃষ্টির পর পরই অতি অল্প সময়ে জীবনচক্র সম্পন্ন করতে সক্ষম।

(ঙ) এদের পাতার ভেতরের দিকে অর্থাৎ নিম্নত্বকে পত্ররন্ধ্র থাকে।

(চ) কম পানি, অতিউত্তাপ ইত্যাদি কারণে এনজাইমের ক্রিয়া কিছুটা কম থাকে, ফলে অধিকাংশ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ধীর গতিতে সম্পন্ন হয়।

খেজুর

ফণিমনসা

ঘৃতকুমারি

বাবলা

শতমূলী

আকন্দ

চিত্র : কয়েকটি মরুজ উদ্ভিদ

লোনামাটির উদ্ভিদ (Halophytes) : যেসব উদ্ভিদ লবণাক্ত পরিবেশে (মাটিতে ও পানিতে) সহজেই জন্মাতে ও বিস্তার লাভ করতে পারে সে সমস্ত উদ্ভিদকে লোনামাটির উদ্ভিদ বা হ্যালোফাইট (halophytes) বলে। এ ধরনের নিবাসে দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ ($NaCl$, $MgCl_2$, $MgSO_4$) বেশি থাকায় সাধারণ উদ্ভিদ সেখান থেকে পানি শোষণ করতে পারে না। তাই সেখানে বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ জন্মায়। মাটিতে প্রচুর পানি থাকা সত্ত্বেও লবণের আধিক্যের কারণে সাধারণ উদ্ভিদের পক্ষে ঐ পানি শোষণ করা সম্ভব হয় না। অগ্রহণযোগ্য পানিযুক্ত এমন মাটিকে শারীরবৃত্তীয় শুস্ক বা উষর মাটি বলা হয়।

লোনামাটির উদ্ভিদ চারটি গ্রুপে বিভক্ত, যথা-

১। লিথোফিলাস (Lithophilous) : লবণাক্ত অঞ্চলের শিলা ও পাথরের নুড়ির উপর জন্মায়।
২। স্যামোফিলাস (Psammophilous) : লোনাপানিতে বালি মাটির উপর জন্মায়।
৩। পেলোফিলাস (Pelophilous) : লোনাপানির কাদা মাটিতে জন্মায়।
৪। হেলোফিলাস (Helophilous) : লবণাক্ত জলাভূমিতে জন্মায়। লবণাক্ত মরু অঞ্চলেও জন্মাতে পারে।

লোনামাটির উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of halophytes) :

১। অধিকাংশ উদ্ভিদ গুল্ম জাতীয়, আর কিছু বিরুৎ। গুল্ম প্রজাতিগুলো ব্যাপক শাখাযুক্ত ঝোপাকার।
২। এ সমস্থ উদ্ভিদের পাতা ও কাণ্ড রসালো হয়।
৩। কর্দমাক্ত মাটিতে খাড়া হয়ে থাকার জন্য স্তম্ভমূল বা ঠেসমূল থাকে যা মাটির সামান্য নিচে বিস্তৃত থাকে।
৪। বিশেষ ধরনের মূল যা অক্সিজেন গ্রহণের জন্য (উল্টা দিকে বর্ধিত হয়) মাটির উপরে উঠে আসে তাকে নিউম্যাটোফোর (pneumatophore) বলে।
৫। মূলের অভ্যন্তরে (কর্টেক্স-এ) বড় বড় বায়ুকুঠুরী থাকে।
৬। এ সমস্থ উদ্ভিদে প্রস্বেদন কম হয়।
৭। অনেক উদ্ভিদে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম (viviparous germination) ঘটে থাকে।
৮। এদের কোষস্থ প্রোটোপ্লাজম কিছুটা আঠালো হয় এবং অভিস্রাবণিক চাপ বেশি থাকে।
৯। উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত খর্বাকার হয় এবং এদের এপিডার্মিস বহুস্তর বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

লবণাক্ত পরিবেশে উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptation of halophytes) : নিম্নোক্ত শিরোনামে লবণাক্ত পরিবেশে উদ্ভিদের অভিযোজন আলোচনা করা হলো-

১। অঙ্গসংস্থানিক অভিযাজন (Morphological adaptation) :

(ক) লবণাক্ত পরিবেশের উদ্ভিদে ভূগর্ভস্থ ও বায়বীয় এ দু'ধরনের মূল দেখা যায়।
(খ) এসমস্থ উদ্ভিদে বায়বীয় মূল বা ঠেস মূল অনেক সময় কান্ডের শাখা-প্রশাখা থেকে সৃষ্টি হয়ে মাটিতে প্রবেশ করে কান্ডের ভার বহন করে।
(গ) বায়ু গ্রহণে সহায়তার জন্য কিছু কিছু উদ্ভিদে শ্বাসমূল বা নিউম্যাটোফোর সৃষ্টি হয়।
(ঘ) এদের কাণ্ড ছোট ও গম্বুজ আকৃতির। কান্ডের নিচের অংশ থেকে ঠেসমূল বের হয়।
(ঙ) পাতায় ক্লোরোফিলের পরিমাণ কম থাকে এবং পাতা পুরু, রসালো, মসৃণ ও চকচকে হয়।

২। অন্তর্গাঠনিক অভিযাজন (Anatomical adaptation) :

(ক) লবণাক্ত উদ্ভিদের মূলতন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন- কর্ক বহুস্তর বিশিষ্ট, কর্টেক্স তারকাকার বা স্টিলেট কোষ দিয়ে গঠিত।
(খ) এসব উদ্ভিদের কিউটিকল কোষগুলো বিচিত্র ধরনের পুরু লিগনিনযুক্ত সংযোগ-প্রাচীর নিয়ে গঠিত, পিথ (pith) কোষগুলো লিগনিনযুক্ত প্রাচীরে গঠিত এবং ট্যানিন ও তেলসমৃদ্ধ।
(গ) এদের কান্ডের কিউটিকল সুগঠিত। এপিডার্মিস পুরু এবং তেল ও ট্যানিনসমৃদ্ধ। হাইপোডার্মিস বহুস্তরবিশিষ্ট এবং পুরু প্রাচীরযুক্ত কোষে গঠিত। পরিবহন কলা সুগঠিত।
(ঘ) এসব উদ্ভিদের পাতার কিউটিকল সুগঠিত। এপিডার্মিস পুরু প্রাচীরযুক্ত কোষে গঠিত।
(ঙ) এদের মেসোফিল প্যালিসেড ও স্পঞ্জি প্যারেনকাইমায় সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত।
(চ) এদের পত্ররন্ধ্র শুধু নিচের এপিডার্মিসে বিন্যস্ত।

৩। শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন (Physiological adaptation) :

(ক) বর্ষাকালে লবণাক্ত উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটে।
(খ) এরা নিউম্যাটোফোরের সুক্ষ্ম ছিদ্রের সাহায্যে শ্বাসকার্য সম্পাদান করে।
(গ) এদের বীজের জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম ঘটে।
(ঘ) এদের শ্বাসমূলের মধ্যে বায়ুকুঠুরী থাকে। এর সাহায্যে অক্সিজেন ধরে রাখতে পারে।

শ্বাসমূল

ঠেসমূল

জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম

চিত্র : লবণাক্ত উদ্ভিদের অভিযোজন

প্রাণির অভিযোজন (Animal Adaptation) : কোনো প্রাণি যখন একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশে দীর্ঘসময় বসবাস করে তখন ঐ পরিবেশের প্রভাবে তার অঙ্গসংস্থানিক, অন্তর্গঠনগত, শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। নিজের অস্বিত্ব রক্ষয় হোক বা নিজের প্রয়োজনেই হোক পরিবেশের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়ানোর জন্য এ এক অভিনব উপায়। যে প্রক্রিয়ায় কোনো প্রাণি তার দৈহিক বা আচরণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজেদের অস্বিত্ব রক্ষায়, বংশবিস্তারে একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে নিজেকে বসবাসের উপযোগী করে তোলে তাকে প্রাণির অভিযোজন বলে। পৃথিবীতে বিস্তৃত যে কোনো জীবেরই নির্দিষ্ট অভিযোজন ক্ষমতা রয়েছে। যেমন- জলজ পরিবেশে বসবাসকারী সকল জীব তার দৈহিক ও শারীরতাত্ত্বিক পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজেদেরকে অভিযোজিত করেছে। তেমনি স্থলজ, মরুজ বা অন্য কোনো পরিবেশে বসবাসকারী প্রাণিদেরও রয়েছে অভিযোজন ক্ষমতা। নিম্নে কতিপয় পরিবেশের অভিযোজন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১। প্রাণির জলজ অভিযোজন (Aquatic adaptation of animal) : পানিতে বসবাসকারী প্রাণিদের জলজ প্রাণি (aquatic animal) বলে। অধিকাংশ জলজ প্রাণি প্রাকৃতিকভাবেই জলজ, কিছু কিছু প্রাণি, বিশেষ করে অনেক জলজ স্তন্যপায়ী গৌণভাবে জলজ অভিযোজন অর্জন করে। জলজ পরিবেশে বসবাস করার জন্য প্রাণির যে গঠনগত, শারীরবৃত্তীয় ও আচরণগত পরিবর্তন ঘটে, তাদের সামগ্রিকভাবে জলজ অভিযোজন বলে। জলজ অভিযোজন দুই ধরনের হতে পারে; যথা-

(ক) প্রাথমিক বা মুখ্য জলজ অভিযোজন (Primary aquatic adaptation) : যেসব প্রাণির পূর্বপুরুষেরা জলেই বসবাস করতো অর্থাৎ কোনো সময়েই স্থলজ ছিল না তাদের অভিযোজনকে প্রাথমিক জলজ অভিযোজন বলে। মাছের দেহে প্রাথমিক জলজ অভিযোজনের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায়। প্রাথমিক জলজ অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

i. **দেহাকৃতি (Body shape) :** দেহ মাকুর ন্যায়, পার্শ্বীয়ভাবে চ্যাপ্টা এবং পিচ্ছিল ফলে পানির ঘর্ষণ প্রতিরোধ করে সহজেই সাuতার কাটতে পারে।

ii. **স্পর্শেন্দ্রিয় রেখা বা পার্শ্ব রেখা (Lateral line or sense organ) :** এই পার্শ্ব রেখা গ্রাহক অঙ্গ হিসেবে কাজ করে, যার সাহায্যে প্রাণি জলের তাপ, চাপ গভীরতা প্রভৃতি নির্ণয় করতে পারে।

iii. **দেহাবরণ (Body covering) :** মাছের দেহ বিভিন্ন ধরনের আuইশ (যেমন- প্ল্যাকয়েড, সাইক্লয়েড টিনয়েড প্রভৃতি) দিয়ে গঠিত, যা দেহ প্রতিরক্ষায় কাজ করে।

iv. **বায়ুথলি বা পটকা (Air bladder) :** অস্থিযুক্ত মাছ তাদের বায়ুপূর্ণ থলি বা পটকা দ্বারা বায়ুর পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে পানিতে ভেসে বা ডুবে থাকতে পারে।

v. **শ্বাস অঙ্গ (Respiratory organ) :** রক্তজালক সমন্বিত ফুলকার মাধ্যমে মাছ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে।

vi. **চোখ (Eye) :** যারা পানিতে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছে, তাদের অভিযোজনকে গৌন জলজ অভিযোজন বলে। গৌণ জলজ প্রাণিরা উভচর বা সম্পূর্ণ জলজ। যেমন- মাছের চোখ পাতলা পর্দা দ্বারা আবৃত থাকায় চোখ পানি থেকে রক্ষা পায়, দৃষ্টিও ব্যাহত হয় না।

vii. **মায়াটোম পেশি (Myotome muscle) :** মেরুদন্ডের দুপাশে অবস্থিত মায়াটোম পেশি, যা সংকোচন করে মাছ সাuতার কাটার সময় মেরুদন্ডকে দুপাশে আন্দোলিত করতে পারে।

viii. **সন্ধিযুক্ত পা (Joint leg) :** স্থলচর প্রাণদের মধ্যে যারা পানিতে চলাচল করে তাদের মধ্যে রাজহাuস, পাতিহাuস ও ব্যাঙের পদগুলো সন্ধিযুক্ত।

(খ) গৌণ জলজ অভিযোজন (Secondary aquatic adaptation) : যেসব পূর্বপুরুষ স্থলচর ছিল কিন্তু পরিবেশের চাপে পরবর্তীকালে স্থল ত্যাগ কনিতে বসবাসকারী হতে পারে। যেমন- কুমির, হাuস, ভোuদড়, প্লাটিপাস, কাছিম, ডলফিন, তিমি ইত্যাদি।

ডলফিন

কাছিম

প্লাটিপাস

হাuস

চিত্র : প্রাণির জলজ অভিযোজন

শিক্ষার্থীর কাজ :

লবণাক্ত পরিবেশে প্রাণির অভিযোজন (Adaptation of animals to saline environments) :

১। লবণ নিয়ন্ত্রণ (Salt control) : কিছু প্রাণি বাইরের লবণাক্ত পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেহাভ্যন্তরের লবণের ঘনত্ব পরিবর্তিত করে ও অভিস্রবণিক চাপ বজায় রেখে নিজেকে রক্ষা করে, একে 'অসমোকনফর্মেশন' বলে। কিছু প্রাণি পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য না রেখেই বিশেষ প্রক্রিয়ায় দেহে লবণের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণে রাখে, একে 'অসমোরেগুলেশন' বলে। লবণ নিয়ন্ত্রণে প্রাণির অভিযোজনের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

(ক) লোনা পানিতে জন্মানো কুমিরের জিহবায় বিশেষ গ্রন্থি সৃষ্টি হয়, যা লবণ বিমোচনে ভূমিকা রাখে।

(খ) মাছ অতিরিক্ত লবণকে গিল (gril) দিয়ে বের করে দেয়।

(গ) সামুদ্রিক পাখির নাসাগহবরের নাসাগ্রন্থি বা লবণগ্রন্থি দিয়ে সর্দি ঝরার মতো করে লবণ বের করে দেয়।

(ঘ) তিমি কখনও লবণাক্ত পানি পান করে না, এরা খাদ্যের নির্যাস থেকে পানির প্রয়োজন মেটায়।

২। অক্সিজেন প্রাপ্তি (Receipt of oxygen) : পানির নিচে বসবাসকারী প্রাণি ফুলকা বা ত্বক দিয়ে অক্সিজেন গ্রহণ করে। তিমি ও অন্যান্য সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীরা পানিপৃষ্ঠে নাক উঠিয়ে শ্বসন সম্পন্ন করে, এদের মাথার চুড়ায় ব্লো-হোল নামক বিশেষ ছিদ্রপথ থাকে। প্রতি শ্বসনে এরা ফুসফুসের আয়তনের ৯০% গ্যাসীয় বিনিময় ঘটায়, এর ফলে পানির নিচে এরা ঘন্টাখানেক বা তারও বেশি সময়কাল থাকতে পারে।

৩। আলো প্রাপ্তি (Receipt of light) : গভীর সমুদ্রের অপর্যাপ্ত আলো বা অন্ধকারে শিকার ধরতে, আহার ও সঙ্গী খুজতে এরা অভিযোজিত, যেমন-

(ক) তিমিরা শিকারের জন্য ইকোলোকেশন বা শব্দের উপর নির্ভর করে।

(খ)কিছু প্রাণির নিজস্ব আলো বিচ্ছুরণকারী অঙ্গ থাকে।

(গ) কিছু প্রাণি আলো উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়া ধরে রাখে।

৪। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ (Temperature control) : সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীর দেহে চর্বি ও যোজক কলানির্মিত তাপ অপরিবাহী স্তর থাকে, এর ফলে এরা দৈহিক তাপমাত্রা স্থির রাখতে পারে। ইহা ছাড়াও কিছু প্রাণিদের (যেমন- বাদুড়, উড়ুক্কু ব্যাঙ, উড়ন্ত কাঠবিড়ালী, খেচর ইত্যাদি) অভিযোজন দেখ যায়।

প্রাণির মরুজ অভিযোজন (Desert adaptation of animals) : মরুজ পরিবেশ চরমভাবাপন্ন। এখানে খুব সংখ্যেক প্রাণি প্রজাতিই বাস করে। তীব্র আলো, উচ্চতাপ, উষ্ণ বালি, পাথর এবং স্বল্পপানি-এ সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করে। মরুভূমি প্রাণিদের অভিযোজনের জন্য দুটি প্রধান পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন- (i). জলাভাবঘটিত অভিযোজন এবং (ii) প্রতিকূল পরিবেশ থেকে আত্মরক্ষামূলক অভিযোজন।

১। জলাভাবঘটিত অভিযোজন (Adaptation caused by drought) :

(ক) কতক প্রাণি (যেমন- মরুভূমির ইদুর, কচ্ছপ ইত্যাদি) পানি পান করে না। এরা রসালো উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে দেহে পানির প্রয়োজন মেটায়।

(খ) ক্যাঙ্গারুব্যাট শুস্ক বীজ ও উদ্ভিদের মধ্যে যে যৎসামান্য পানি থাকে তা গ্রহণ করে বেঁচে থাকে।

(গ) ফ্রাইপোসোমা, মোলক হরিদাস ইত্যাদি প্রাণি সামান্য পানি পেলেই চামড়া দিয়ে পানি শোষণ করে নেয়।

(ঘ) মরুভূমির প্রাণিরা রেচনকালে পানি অপচয় রোধ করে। এরা অর্ধ শক্ত মূত্র ত্যাগ করে।

(ঙ) উট তার কুuজের মধ্যে অবস্থিত চর্বির বিপাক ঘটিয়ে পানি উৎপন্ন করে। এরা ১ গ্রাম চর্বি থেকে ১ গ্রাম পানি উৎপন্ন করে।

২। আত্মরক্ষামূলক অভিযোজন (Self-adaptation) :

প্রচন্ড উত্তাপ ও প্রচন্ড ঠান্ডা থেকে আত্মরক্ষা (Protect yourself from extreme heat and extreme cold) :

(ক) মরুজ প্রাণিরা তাদের দেহে চামড়ার থলে, কন্টক ও ডারমাল ফ্লাট-এর মাধ্যমে মরুভূমির প্রখর তাপ রোধ করতে সক্ষম হয়।

(খ) কোরালা নিজেদের হাত পায়ে থুথু ছিটিয়ে দেহকে ঠান্ডা রাখে।

(গ) এরা প্রচন্ড উত্তাপে মরুদ্যানে বা পাহাড়ের আড়ালে আশ্রয় নেয় আবার প্রচন্ড ঠান্ডায় বালির মধ্যে গর্ত করে আশ্রয় গ্রহণ করে।

(ঘ) বিটল এবং লিজার্ড উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে যা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

(ঙ) কিছু কিছু মরু প্রাণি আশ্রয়-বিবর তৈরি করে না। পাথরের আড়ালে অথবা মরুদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করে উত্তাপের হাত থেকে নিজকে রক্ষা করে।

৩। বালুঝড় থেকে আত্মরক্ষা (Sandstorm protection) :

(ক) উটের চোখে বড় বড় পল্লব লোম থেকে।

(খ) উটের কর্ণছিদ্র ঘন লোম দ্বারা সুরক্ষিত থাকে।

(গ) উট বহি :নাসারন্ধ্রকে কপাটিকার মতো বন্ধ করতে পারে।

৪। শত্রু প্রাণি থেকে আত্মরক্ষা (Self-defense from enemy animals) :

(ক) শত্রু প্রাণি থেকে আত্মরক্ষার জন্য মরুপ্রাণিদের বিস কার্যকরী হয়। হেলোডারমা নামক গিরগিটি, ট্যারেন্টুলা মাকড়সা সাংঘাতিক বিষাক্ত হয়।

(খ) কোনো কোনো মরুপ্রাণির দেহ থেকে উৎকট গন্ধ বের হয়।

(গ) হর্ণ টোড, হর্ণ লিজার্ডের ত্বকে শক্ত কন্টক থাকে।

৫। গতি (Speed) :

(ক) মরুবাসী প্রাণির অধিকাংশই দ্রুতগামী।

(খ) উটপাখির পায়ের নিচে মাংশল প্যাডে শক্ত পুরু চামড়ার আবরণ থাকায় এরা তপ্ত বালির উপর স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করে।

(গ) মরু বিড়ালের পায়ের তলা রোমযুক্ত, ফলে উত্তপ্ত বালুতে হাটতে কোনো কষ্ট হয় না।

লবণাক্ত পরিবেশে তিমির অভিযোজন

লবণাক্ত পরিবেশে কুমিরের অভিযোজন

উটপাখির মরুজ অভিযোজন

উটের মরুজ অভিযোবেজন

জীবভূমি/বায়োম (Biome) : পৃথিবীতে কোন উদ্ভিদ বা প্রাণি কোথায় জন্মাবে বা কোথায় প্রজনন সম্পন্ন করবে তা অনেকগুলো প্রভাবকের উপর নির্ভর করে। কারণ জীবের সাথে জীবের, জীবের সাথে জড় মাধ্যম এবং পরিবেশের বিভিন্ন দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান উপাদানের মধ্যে সবসময় অন্তঃক্রিয়া পরিচালিত হয়। এমন অন্তঃক্রিয়ার ফলে যে উদ্ভিদ বা প্রাণি যে স্থানের জন্য উপযুক্ত হবে সেই উদ্ভিদ বা প্রাণি সেখানেই জন্মাবে। ইকোসিস্টেমকে যখন বিশ্বমাত্রায় প্রকাশ করা হয় তখন তাকে বায়োম বলে। একটি নির্দিষ্ট জলবায়ুর প্রভাবে উদ্ভিদকূল ও প্রাণিকূলের সমন্বয়ে গঠিত বৃহৎ জৈবিক সম্প্রদায়ের ভৌগলিক একককে বায়োম বলা হয়। বস্তুত কোনো নির্দিষ্ট জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত biota দ্বারা biotic community গঠিত এবং community-গুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয় বায়োম।

বায়োম মূলত কতকগুলো কমিউনিটি (community) নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক কমিউনিটির সকল উদ্ভিদ ও প্রাণি বায়োমের সদস্য। প্রতিটি বায়োমের সাধারণ প্রকৃতি ও বিস্তৃতি নির্ভর করে বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, মাটির বনুন ও গঠণ, পরিবেশীয় বাধা (যেমন- পহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, হ্রদ, মরুভূমি প্রভৃতি) ইত্যাদির উপর। প্রধানত, ভূমিরূপ, জলবায়ু ও প্রধান উদ্ভিজ্জ ও প্রাণি সম্মিলিতভাবে এক একটি বায়োম গঠন করে থাকে। তবে দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে বায়োমের যেমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে তেমনি স্থানচ্যুতিও ঘটে।

বায়োমের প্রকারভেদ (Kinds of biome) : পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের বায়োমের উপস্থিতি রয়েছে। সমস্ত বায়োমকে মূলত প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- ১। স্থলজ বায়োম (terrestrial biome) ও ২। জলজ বায়োম (aquatic biome)।

১। স্থলজ বায়োম (Terrestrial biome) : যেসব বায়োম স্থলভাগে অবস্থিত তাদেরকে স্থলজ বায়োম বলে। জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ এবং অবস্থানের ভিত্তিতে স্থলজ বায়োম বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে, যথা-

(ক) মরুভূমির বায়োম (Desert biome) : পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত আছে মরুভূমির বায়োম। মরুভূমি হচ্ছে এমন শুষ্ক ভূখন্ড যেখানে তাপমাত্রা রাতে ০° সেলসিয়াস এবং দিনে ৪৫° সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে; বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত বা বর্ষণ ৫-১০ ইঞ্চি (১২।৫-২৫ সে.মি.); বর্ষনের চেয়ে বাস্পীভবনের হার বেশি। এখানকার জীবজগত বিশেষভাবে অভিযোজিত ও বিক্ষিপ্ত অবস্থিত। কর্কট ও মকর ক্রান্তীয় দুইটি বৃহৎ বেল্ট সংলগ্ন অঞ্চলে মরুভূমিগুলো অবস্থিত। ক্রান্তীয় শুস্ক মরুভূমিগুলো অপেক্ষাকৃত উষ্ণ, কিন্তু উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ শুষ্ক মরুভূমিগুলো অপেক্ষাকৃত শীতল এবং শীতকালে তুষারপাত হয়। সবচেয়ে বড় মরুভূমি আফ্রিকার সাহারা। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, এশিয়ার গোবি, ভারতের রাজস্থানসহ আরবের মরুভূমি, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মরুভূমি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

- **পরিবেশ (Environment) :** প্রখর সূর্যালোক, মেঘশূন্য শুস্ক বায়ুমন্ডল, বালিময় ও শিলাময় নিবাস এবং দিন ও রাতে যথাক্রমে উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রার উগ্রতা (severity) শুস্ক মরুভূমির পরিবেশীয় অবস্থাগুলোর অন্যতম। এটা অতি উত্তপ্ত অঞ্চল, যেখানে স্থায়ী বা সাময়িক প্রবাহিত কোনো জলাশয় নেই। মাটিতে জৈব পুষ্টির পরিমাণ খুব কম বা অনুপস্থিত। মাটিতে পুষ্টি থাকলেও পানির খুব অভাব।
- **উদ্ভিদ (Plant) :** মরুভূমির উদ্ভিদগুলো সাধারণত বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তৃত, কন্টকাবৃত ঝোপ এবং রসালো। নগ্ন শিলা ও বালিময় নিবাসে মাঝে মাঝে বাবলা, আকন্দ, ক্যাকটাস ও খেজুর গাছ মরুভূমি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। এ সমস্ত উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতা পুরু কিউটিকলযুক্ত ও কন্টকাবৃত। এখানে বর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ জন্মে। বর্ষজীবী উদ্ভিদের জীবনকাল খুব সীমিত আর বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদগুলোতে পানির অপচয় রোধের ব্যবস্থা রয়েছে এবং তাদের বৃদ্ধিও খুব কম।
- **প্রাণি (Animal) :** সাধারণত ধারনা করা হয় যে, মরুভূমি প্রাণিহীন, কিন্তু এখানে এমন অনেক প্রাণি দেখা যায় যারা শুষ্ক, উত্তপ্ত ও সংকটময় জীবন যাপনে অভিযোজিত। উল্লেখ্য যে, মরুভূমির অনেক প্রাণি মূত্রত্যাগের সময় তরল urine-এর পরিবর্তে দানাকৃতির uric acid ত্যাগ করে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রপ্রাণি দিবাভাগে প্রখর সূর্যালোক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গর্তে বসবাস করে এবং রাত্রিকালে খাদ্যের সন্ধানে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। মরুভূমিতে প্রাণির সংখ্যা কম হলেও বিচিত্র ধরনের। যেমন- স্তন্যপায়ীদের মধ্যে উট, দুম্বা, জ্যাক র‍্যাবিট, ক্যাঙ্গারু ইঁদুর, খেকশিয়াল প্রধান। পাখিদের মধ্যে উটপাখি, এমু, টার্কি, শকুন, দাঁড়কাক উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিছা, কাকড়া, মাকড়শা, মধুপাখি ইত্যাদি দেখা যায়।

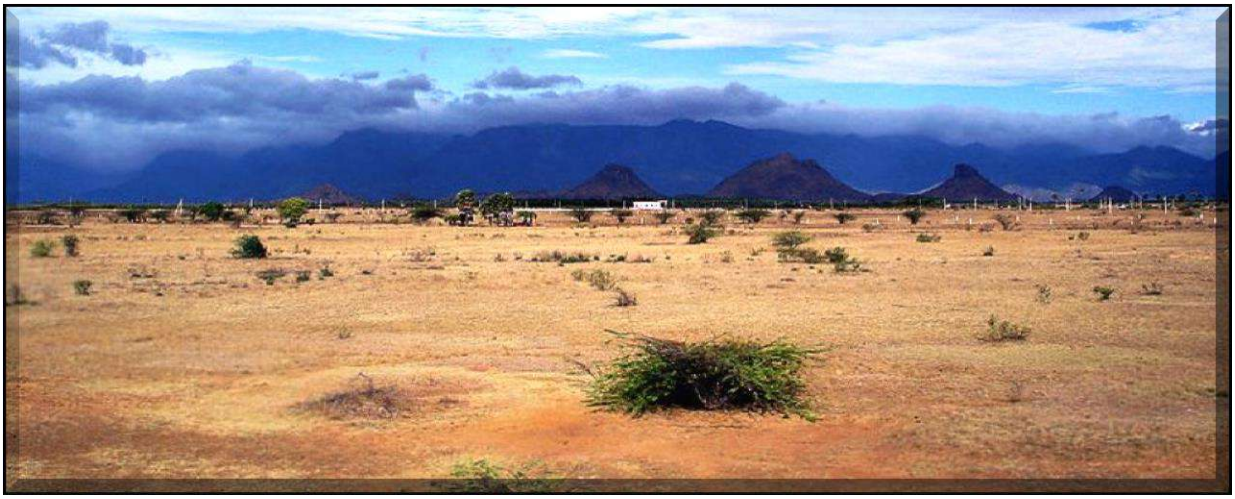

চিত্র : মরুভূমির বায়োম

(খ) তৃর্ণভূমির বায়োম (Grassland Biome) : পৃথিবীর যে অঞ্চলে প্রধানত ঘাস জন্মে কিন্তু বড় গুল্ম বা বৃক্ষ জন্মে না তেমন এলাকা নিয়ে তৃর্ণভূমির বায়োম গঠিত। উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ ও ক্রান্তীয় অঞ্চলে তৃর্ণভূমি বিস্তৃত। যথা- উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়ার মধ্যমরু অঞ্চলের উত্তরাংশ, আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকার উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে এবং সাইবেরিয়ায় তৃর্ণভূমি বিস্তৃত। কোনো কোনো বিজ্ঞানী তাপমাত্রা ও তৃর্ণের পার্থক্যের ভিত্তিতে তৃর্ণভূমির বায়োমকে গ্রীষ্মমন্ডলীয় সাভানা (tropical savanna) এবং শীতপ্রধান তৃর্ণভূমি (temperate grassland) নামক দুটি অঞ্চলে বিভক্ত করেন।

নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলের বৃক্ষ ও গুল্ম বর্জিত বিশাল তৃর্ণভূমিগুলো প্রেইরি (prairies) নামে পরিচিত। অপরপক্ষে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় মন্ডলে কিছু সংখ্যেক বিক্ষিপ্ত গুল্ম ও বৃক্ষ দ্বারা সুশোভিত তৃর্ণভূমিগুলো সাভানা (Savanna) নামে পরিচিত।

- **পরিবেশ (Environment) :** এখানে ২৫-৭৫ সে.মি. বৃষ্টিপাত হয়। ব্যাপক বনভূমি যেমন নেই তেমনি প্রকৃত মরুভূমিও নাই। মাটি হিউমাসসমৃদ্ধ, দিনে ও রাতে তাপমাত্রা কম বেশি হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। শীতে তাপমাত্রা ১৫° সে. এ নেমে যায় আর গ্রীষ্মকালে ৩২° সে. এর উপরে উঠে। এ অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০-৩০ ইঞ্চি।
- **উদ্ভিদ (Plant) :** ঘাস এ অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ। ঘাসের পাতা সরু এবং খাড়াভাবে থাকে তাই প্রস্বেদন কম হয়। বড় ঘাস ১২-১৫ সে.মি. লম্বা হয়। এরা গুচ্ছাকারে জন্মায়। যব, গম রাই ভাল জন্মে। বৃক্ষ ও গুল্ম সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ অঞ্চলকে পৃথিবীর চারণভূমি বলে।
- **প্রাণি (Animal) :** বিভিন্ন প্রকার তৃর্ণভূমিতে প্রাণিকূলের মধ্যে হাতি, মহিষ,, বাইসন, জেব্রা, কুকুর, কোয়াট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এদের অনেককে সিংহ, বাঘ ও চিতাবাঘ ভক্ষণ করে থাকে। হায়েনা ও শকুন মৃতদেহ ভক্ষকদের অন্যতম। উল্লেখ্য যে, অস্ট্রেলিয়ার তৃর্ণভূমিতে মারসুপিয়াল (marsupial) ক্যাঙ্গারু দৃষ্টিগোচর হয়।

(গ) তুন্দ্রা বায়োম (Tundra Biome) : বিষুবরেখা থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত বৃক্ষহীন মেরু অঞ্চল তুন্দ্রা নামে পরিচিত। প্রায় ৫০ লক্ষ একর বিস্তৃত তুন্দ্রা বায়োম উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশ, সাইবেরিয়া ও ইউরোপের উত্তরাংশে সীমাবদ্ধ যা স্থলভাগের প্রায় এক দশমাংশ।

- **পরিবেশ (Environment) :** এই অঞ্চলের তাপমাত্রা খুব নিম্ন। চরম শীত ও ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে বছরের দীর্ঘ সময় বরফে ঢাকা থাকে। গ্রীষ্মের ২-৩ মাস সূর্য ডোবে না, তখন গড় তাপমাত্রা ৯° সেলসিয়াস এবং তখনই উপরের কিছু বরফ গলে ছোট ছোট জলাভূমির সৃষ্টি হয়। এই স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মকাল ছাড়া শীতকালে সারা বছর তুন্দ্রা অঞ্চল বরফে আবৃত থাকে এবং তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর নিচে। নিম্ন তাপমাত্রাই এই অঞ্চলের প্রধান প্রতিবন্ধক। বার্ষিক তুষারপাতের পরিমান প্রায় ১০ ইঞ্চি। বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম।
- **উদ্ভিদ (Plant) :** এ অঞ্চলের উদ্ভিদের জীবনকাল খুবই সংক্ষিপ্ত। মাটি অনুর্বর এবং উষর হওয়ায় এখানে জীববৈচিত্র্য অত্যন্ত কম। মস (reindeer moss) নামের লাইকেনসহ (*Cladomia sp.*) কিছু লাইকেন প্রজাতি, পলিট্রিকাম (*Polytrichum*) মস, কিছু স্বল্পায়ু বীরুৎ প্রজাতি, তৃণ ও কিছুসংখ্যেক ছোট গুল্ম তুন্দ্রা বায়োমের প্রধান উদ্ভিদ।
- **প্রাণি (Animal) :** এখানে প্রাণির সংখ্যা খুব কম। বেশি ঠান্ডার জন্য উভচর, সরীসৃপ ও মাছ নাই অথবা খুবই কম। এখানে প্রধানত উষ্ণ রক্তের স্তন্যপায়ী এবং গ্রীষ্মকালে কিছু যাযাবর পাখি দেখা যায়। স্তন্যপায়ী প্রাণিকূলের মধ্যে বল্গা হরিণ (reindeer), সুমেরু খরগোশ (aretic hare), সুমেরু খেকশিয়াল (aretic fox), মেরু ভালুক (polar bear), নেকড়ে ইত্যাদি প্রধান। লেমিং (lemmings) নামের স্তন্যপায়ী আলাস্কা ও উত্তর আমেরিকায় দেখা যায়। Muskox পাওয়া যায় গ্রিনল্যান্ড ও উত্তর আমেরিকায়। গ্রীষ্মকালের বৃদ্ধি সময়ে (growth period) তুন্দ্রা অঞ্চলে নিচের মালভূমি অঞ্চল থেকে ভেড়া, পাহাড়ি ছাগল, হরিণ ও এলক (elk) তৃণ ও গুল্ম খাদ্যের লোভে উঠে আসে।

চিত্র : তৃর্ণভূমির বায়োম

চিত্র : তুন্দ্রা বায়োম

(ঘ) বনভূমি বায়োম (Forest Biome) : ভূ-পৃষ্টের এক তৃতীয়াংশ এলাকা বনভূমিতে আবৃত। স্থলচর উদ্ভিদের দুই-তৃতীয়াংশ এবং জ্যান্ত জীবের ৭০% কার্বন জমে আছে বনভূমি বায়োমে। এটি বৃষ্টিপাতবহুল এলাকা হওয়ায় এ সমস্ত অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে আছে বৃক্ষ এবং অন্যান্য কাষ্ঠল উদ্ভিজ্জ, এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণি। পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষায় এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এমনকি একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বনভূমি দেখা যায়। বনভূমি বায়োম বিভিন্ন প্রকার :

চিত্র : বনভূমি বায়োম

১। ক্রান্তীয় বৃষ্টি-অরণ্য (Tropical rain forest) : এই জাতীয় অরণ্য পৃথিবীর অরণ্যগুলোর মধ্যে সর্বাধিক সমৃদ্ধ এবং সবচেয়ে বেশী জীববৈচিত্র্যের সমাহার নিয়ে ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য পৃথিবীর অপরিহার্য বায়োম হিসেবে টিকে আছে। এদেরকে নিরক্ষীয় ও চিরহরিৎ অরণ্য নামেও অভিহিত করা হয়। অবশ্য দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান অববাহিকার নিরক্ষীয় চিরহরিৎ অরণ্য সেলভা (Selva) নামে পরিচিত।

- **পরিবেশ (Environment) :** বৃষ্টি অরণ্যের নিবাসে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৫-২৭° ডিগ্রী সেলসিয়াস, বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৮০-১৬০ ইঞ্চি এবং বায়ুমন্ডলের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৫%। তদুপরি, এই অরণ্যাঞ্চলগুলোতে বিশেষ কোনো ঋতু নেই এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাত সর্বাধিক (২০০ ইঞ্চি)। কিছু অরণ্য অতি নিবিড় হওয়ায় তলদেশে সূর্যালোক কদাচিৎ পৌঁছে। এই অরণ্যগুলো সাধারণত সমতল ভূমিতে অবস্থিত। কিন্তু এদেরকে পাহাড়ের নিম্ন ঢালু ভূমিতেও ৩০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করতে দেখা গিয়েছে। বৃষ্টি অরণ্যের মাটিতে পানির পরিমাণ সাধারণত সর্বাধিক ধারণ ক্ষমতার অতি নিকটে থাকে তাই আবহাওয়া স্যাঁতসেঁতে ও আর্দ্র।
- **উদ্ভিদ (Plant) :** এই অরণ্যগুলোতে বৃক্ষ প্রজাতির সংখ্যা খুব বেশি এবং উদ্ভিদ সম্প্রদায় খুব মিশ্র। অরণ্যাঞ্চলের প্রায় এলাকায় প্রতি বর্গমাইলের মধ্যে ৩০০টি বৃক্ষ প্রজাতি দৃষ্টিগোচর হয়। অরণ্যগুলো বহু স্তরবিশিষ্ট। বৃক্ষ প্রজাতিগুলো সাধারণত তিনটি উলম্ব স্তরে সজ্জিত এবং দূর থেকে দেখলে মনে হয় বনের উপরে বন সজ্জিত রয়েছে। সর্বোচ্চ স্তরের বৃক্ষগুলোর উচ্চতা ২০০ ফুট হয় এবং সেগুলো প্রধান বৃক্ষ-চাঁদোয়ার (tree canopy) উপরে উঠে। দ্বিতীয় স্তরের বৃক্ষ ৫০-১০০ ফুট পর্যন্ত উচু হয়। তৃতীয় বৃক্ষ স্তরের নিচে গুল্ম এবং তার নিচে বীরুৎ ও ভূস্তর থাকে। বৃক্ষ চাঁদোয়ায় প্রচুর পরিমাণে পরাশ্রয়ী (epiphytes) উদ্ভিদ জন্মে। আলোকপ্রিয় পরাশ্রয়ীদের মধ্যে গাছ-আনারস ও রসনা জাতীয় উদ্ভিদ (Bromeliads and Orchids) আর ছায়াপ্রিয় পরাশ্রয়ী (যেমন- শৈবাল, মস ও ফার্ণ) অপেক্ষাকৃত নিচের স্তরে ছায়াময় শাখা-প্রশাখায় জন্মে। পরাশ্রয়ী ছাড়াও বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় পরজীবী ও অর্ধ-পরজীবী (parasites and hemi-parasites) উদ্ভিদ প্রচুর দেখা যায়।
- **প্রাণি (Animal) :** এই অরণ্যগুলো শুধু উদ্ভিদকূলই সমৃদ্ধ নয়, বরং প্রাণিকূলেও (Fauna) সমপরিমাণে সমৃদ্ধ। প্রাণিকূলের মধ্যে বানর, ইদুর, পাখি, উভচর প্রাণি, শামুক, জোক, পিঁপড়া ও উইপোকাসহ নানা প্রকার পতঙ্গ উল্লেখযোগ্য।

২। পর্ণমোচী বনাঞ্চল (Deciduous forest) : এই অরণ্যের বৃক্ষ প্রজাতিগুলোর শরৎকালে পাতা ঝরে যাওয়ায় সারা শীতকালে আর পাতা থাকে না এবং শীতকালের শেষে নতুন পাতা গজায়। তাই এগুলো পর্ণমোচী বন নামে পরিচিত। এই অরণ্য উত্তর গোলার্ধে সরলবর্গীয় অরণ্যের দক্ষিণে অবস্থিত এবং প্রশস্তপত্রী পর্ণমোচী বৃক্ষ প্রজাতি দ্বারা গঠিত। ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও বাংলাদেশে এই অরণ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

- **পরিবেশ (Environment) :** মাটি অত্যন্ত পুষ্টি সমৃদ্ধ। ঝরাপাতা পচে মাটিতে পুষ্টি জোগায়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৩০-৬০ ইঞ্চি (৭৫-১৫০ সে.মি.)। যে অঞ্চলে তুষারপাত ঘটে তাকে ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বন আর যেখানে তুষারপাত ঘটে না তাকে আর্দ্র পর্ণমোচী বন বলে। বাংলাদেশের শালবন আর্দ্র পর্ণমোচীর উদাহরণ।
- **উদ্ভিদ (Plant) :** এ বনে বীচ, ওক, ম্যাপল, হিকোরি, শাল, পলাশ প্রভৃতি গাছ জন্মে। বৃষ্টি বহুল হওয়ায় বড় বৃক্ষের নিচে গুল্ম ও লতা জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে। এমন বনে শীত ও গ্রীষ্মের চেহারা সম্পূর্ণ রুপে বদলে যায়।
- **প্রাণি (Animal) :** বিচিত্র ধরনের প্রাণি এসব বনে দেখা যায়। এসব প্রাণিদের মধ্যে হরিণ, খেঁকশিয়াল, ভালুক, কাঠবিড়ালী, কীটপতঙ্গ ও বিভিন্ন প্রজাতির অমেরুদন্ডী প্রাণি উল্লেখযোগ্য।

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বায়োম (Mangrove Biome) : ক্রান্তীয় মন্ডলের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলসমুহে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বিশেষ গুরত্বপূর্ণ। এমনকি উপক্রান্তীয় অঞ্চলের (২৩।৫-৩৩।৫ ডিগ্রী অক্ষাংশ) সমুদ্র তীরেও এ জাতীয় উদ্ভিজ্জ দেখা যায়। উপকূলবর্তী এলাকাসমুহ জোয়ার-ভাটায় পরিপূর্ণ ও লবণাক্ত। তাই অরণ্যগুলো খুব সমৃদ্ধ নয়। উক্ত জোয়ারের সময় এদেরকে প্লাবিত অরণ্য বলে মনে হয়। বাংলাদেশের সুন্দরবন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পৃথিবীর এ ধরনের অরণ্যগুলো আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় এবং উত্তর অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে অবস্থিত। অবশ্য আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল, মধ্য আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দীপপুঞ্জের উপকূল অঞ্চলেও কিছু কিছু দেখা যায়।

- **পরিবেশ (Environment) :** নিবাসে জোয়ার-ভাটা ও লবণাক্তর জন্য সমুদ্র তীরবর্তী গাছপালায় বিশেষ বিশেষ অভিযোজন পরিলক্ষিত হয়। অভিযোজনগুলোর মধ্যে শ্বাসমূল (pneumatophore), জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম (viviparous germination) ও ঠেসমূল (stilt root) খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রাত্যহিক জোয়ার-ভাটার কারণে নিবাসের মাটি সিক্ত, কর্দমাক্ত ও অধিক লবনযুক্ত। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১৬০-২০০ সে.মি.। পৃথিবীর বিভিন্ন ম্যানগ্রোভ অরণ্যে জলবায়ুগত তারতম্য থাকা সত্ত্বেও তাদের উপকূলীয় গঠণ ও অভিযোজন প্রায় অনুরূপ।
- **উদ্ভিদ (Plant) :** উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদের মধ্যে সুন্দরী, গরান, গোরিয়া, খামো, খালসি, কেওড়া, গেওয়া, বাইন. হিতল, গোলপাতা প্রধান। এছাড়া কেয়া, ছাগলখুরলতা, টাইগার ফার্ণ, বিভিন্ন প্রকার আরোহীলতা উল্লেখযোগ্য।
- **প্রাণি (Animal) :** এখানে উল্লেখযোগ্য প্রাণি হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতাবাঘ, বানর, চিত্রা হরিণ, বন্য শুকর, জলজ কুমির। পক্ষীকূলের মধ্যে চিল, কবুতর, বক, টিয়া ও ডাহুক প্রধান। এছাড়াও রয়েছে মৌমাছি, ক্ষুদিমাছি, বিটলস, বোলতা ও ভিমরুলসহ বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ।

চিত্র : ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বায়োম

জলজ বায়োম (Aquatic Biome) : পৃথিবীপৃষ্ঠে জলময় পরিবেশের বায়োমগুলো একত্রে জলজ বায়োম নামে পরিচিত। পানিতে দ্রবীভূত আয়নের ঘণত্বের উপর ভিত্তি করে জলজ বায়োম প্রধানত দু প্রকার। যথা- স্বাদু পানির বায়োম ও লবণাক্ত পানির বায়োম।

স্বাদু পানির বায়োম (Freshwater Biome) : যেসব পানিতে শতকরা এক ভাগের কম লবণাক্ততা থাকে তাকে স্বাদু পানি বলে। কিছু ব্যাতিক্রম ছাড়া যেসব প্রজাতি স্বাদু পানিতে বাস করে তারা লবণাক্ত পানিতে বসবাস করতে পারে না। এ ধরনের বায়োম পৃথিবীর জীবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই পরিবেশ মানুষ ও অন্যান্য জীবের জন্য খাবার পানির উৎস এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের বায়োমকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন- ১। পুকুর ও হ্রদ, ২। জলাভূমি ও ৩। নদী। নিম্নে এদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো-

১। পুকুর ও হ্রদ (Ponds & Lakes) : এসব অঞ্চল কয়েক বর্গমিটার থেকে কয়েক হাজার বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। পৃথিবী জুড়ে পুকুর ও হ্রদ বিস্তৃত। কিন্তু পুকুর ঋতুভিত্তিক, মাত্র কয়েক মাস স্থায়ী হয়, কিন্তু হ্রদের স্থায়িত্ব শত শত বছর ব্যাপি। পুকুর ও হ্রদ যেহেতু পৃথক জলাশয় হিসেবে থাকে এবং অন্যান্য জলাশয় যেমন- নদী, সাগর ইত্যাদির সাথে সংযোগ থাকে না সেকারণে এখানে প্রজাতি বৈচিত্র্য কম থাকে।

২। জলাভূমি (Wetland) : অগভীর, স্যাঁতসেঁতে, স্থির পানির জলাশয়কে সাধারণত জলাধার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন- হাওর, বাঁওড়, বিল, ঝিল ইত্যাদি। বাংলাদেশে অসংখ্য জলাভূমি রয়েছে তার মধ্যে দুটি জলাভূমি আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যেমন- টাঙ্গুয়ার হাওর ও সুন্দরবনের জলাভূমি। জলাভূমিতে জীববৈচিত্র্যের হার সবচেয়ে বেশি বলে এদের গুরুত্বও বেশি।

- **পরিবেশ (Environment) :** এগুলো স্থায়ী বা অস্থায়ী, লোনাপানি বা মিঠাপানির জলাধার। এদের কোনোগুলিতে স্রোত থাকে আবার কোনোগুলি বদ্ধ জলাভূমি।
- **উদ্ভিদ (Plant) :** বিশ্বে জলাভূমিতে ৫০০০ এর বেশি সপুষ্পক উদ্ভিদ জন্মে আর বাংলাদেশে এর সংখ্যা ১৫৪টি। বাংলাদেশে জলজ উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদগুলো হলো পানিফল, মাখনা, শাপলা, পদ্ম, হোগলা, কচুরিপানা প্রভৃতি।
- **প্রাণি (Animal) :** অসংখ্য প্রজাতির মাছ, সরীসৃপ, উভচর প্রাণি, স্তন্যপায়ী সহ অসংখ্য জীব এ জলাভূমিতে বসবাস করে বিশাল জীববৈচিত্র্যতার সৃষ্টি করেছে।

৩। নদী (River) : সহজ ভাষায় নদীর অর্থ হলো প্রবাহমান পানি। নদীর বিস্তৃতি পৃথিবীর সবখানে। নদীর পানিতে গতি থাকে, আর সে গতি হয় একমুখী। ঝর্ণা, গলিত হিমবাহ এমনকি হ্রদ থেকেও নদীর সৃস্টি হতে পারে। নদী যেখান থেকে সৃষ্টি হয় তাকে নদীর উৎস বলে। উৎপত্তি লাভের পর চলার পথে অসংখ্য উপধারা এসে মিলিত হয়ে নদীবুক প্রবাহমান করে তোলে। প্রবাহমান নদী সবশেষে সাগরে মিলিত হয়। যে স্থানে নদী সাগরে মিলিত হয় সে স্থানটিকে মোহনা বলে।

- **পরিবেশ (Environment) :** নদীর উৎসমুখে প্রচুর নুড়ি পাথর থাকে। সেখানে পানির স্রোত বেশি, তাপমাত্রা কম, পানি স্বচ্ছ এবং প্রচুর অক্সিজেন থাকে। মাঝামাঝি ও সমতল ভূমিতে চওড়া। শেষদিকে পানিতে প্রচুর পলি থাকায় ঘোলাটে হয়।
- **উদ্ভিদ (Plant) :** নদীর পানিতে প্রচুর শৈবাল, কিনারায় মস, বিভিন্ন ধরনের ভাসমান জলজ উদ্ভিদ জন্মে থাকে।
- **প্রাণি (Animal) :** মেরুদন্ডী প্রাণিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মাছ প্রধান। স্তন্যপায়ীর মধ্যে শুশুক আর সরীসৃপের মধ্যে কুমির, ঘড়িয়াল, কাছিম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সামুদ্রিক বায়োম (Marine Biome) : সাগর, মহাসাগর ও মোহনা মিলে পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় ৭০ ভাগ দখল করে আছে লোনা পানির মাধ্যম। এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও প্রথম বায়োম। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বায়োম, কারণ এখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অক্সিজেন তৈরি হয় এবং সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড গৃহীত হয়। এদের মধ্যে সমুদ্রের তলদেশে কিছু কিছু অঞ্চলে বিশাল পর্বতমালা, এমনকি আগ্নেয়গিরি বিদ্যমান। সমুদ্রের পানি বাস্পীভূত হয়ে স্থলে বৃষ্টিপাতের পানির যোগান দেয়। এ ধরনের বায়োমে সব ধরনের অঞ্চলে ব্যাপক জীববৈচিত্র্যতা বিদ্যমান।

তবে সমুদ্রকে কেবল একটি বায়োম হিসেবে চিহ্নিত করা চলে না। বিভিন্ন মহাসাগরের ভৌত ও রাসায়নিক উপাদানসমুহে এতো তারতম্য রয়েছে যে এর মধ্যে অসংখ্য বায়োমের পরিবেশ চিহ্নিত করা যায়। ই পি ওডাম ১৯৭১ সালে সামুদ্রিক বায়োমের কতগুলো বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন, যেমন-

(ক) সমুদ্র বৃহৎ, এটি পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় ৭০% কে আবৃত করে রাখে।

(খ) সমুদ্র গভীর এবং এর সকল গভীরতায় জীব পাওয়া যায়। মহাদেশ এবং দ্বীপ সংলগ্ন এলাকাতে জীব অধিক ঘনত্বে থাকে।

(গ) সমুদ্র অবিচ্ছিন্ন (continuous), সকল সাগরই একত্রে সংযুক্ত। তাপমাত্রা, লবণাক্ততা (salinity) এবং গভীরতা সামুদ্রিক জীবের মুক্ত চলাচলের প্রধান প্রতিবন্ধক (barriers)।

(ঘ) সমুদ্র সর্বদা স্রোতময় থাকে; মেরু ও বিষুবীয় অঞ্চলের বায়ুর তাপমাত্রার তারতম্য এবং পৃথিবীর অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণনের ফলে এ ধরনের স্রোত তৈরি হয়।

(ঙ) সমুদ্রে বিভিন্ন ধরনের ঢেউ এবং জোয়ার-ভাটা অবস্থা বিরজিত থাকে, চাঁদ ও সূর্যের টানের প্রভাবে এগুলো সৃষ্টি হয়।

(চ) সমুদ্র লবণাক্ত; এর গড় লবণাক্ততা ৩.৫%।

(ছ) সমুদ্রের ঢেউ, স্রোত, জোয়ার-ভাটা, তাপমাত্রা ইত্যাদি সামুদ্রিক জীবজগতকে প্রভাবিত করে।

সামুদ্রিক বায়োমকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- ১। সাগর (Ocean), ২। প্রবাল প্রাচীর (Coral reel) ও ৩। মোহনা (Estuary)।

১। সাগর (Ocean) : পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও বৈচিত্র্যময় বায়োম হলো সমুদ্র। এটি পৃথিবীর প্রায় ৭০% এলাকাকে আবৃত করে আছে। সমুদ্র সর্বদা স্রোতময় থাকে। মেরু ও বিষুবীয় অঞ্চলের তাপমাত্রার তারতম্য এবং পৃথবী অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণনের ফলে এ ধরনের স্রোতের সৃষ্টি হয়। সাগরের লবণাক্ততা প্রায় ৩৫ পিপিএম এবং pH-৮। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের পৃষ্ঠতলে পানির তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াস আর মেরু অঞ্চলে ৩° সেলসিয়াস।

২। প্রবাল প্রাচীর (Coral reel) : এটি পৃথিবীর বৈচিত্র্যময় বায়োম। প্রবাল হলো- সাদা অমসৃণ পাথরের মতো দৃশ্যমান বস্তু যেটি এক ধরনের প্রাণির দেহ থেকে নিঃসৃত শক্ত চুনাপাথরের গাঠনিক আবরণ বিশেষ যাকে কোরালাম বলে। শামুক বা ঝিনুকের দেহের চারধারে যেমন শক্ত আবরণী খোলস সৃষ্টি করে; প্রবালের দেহ অনেকটা সে ধরনের, যা রাসায়নিক চরিত্রে ক্যালসিয়াম-কার্বনেট সমৃদ্ধ। প্রবাল পাথর সৃষ্টিকারী প্রাণিগুলো খুবই ক্ষুদ্রাকৃতির, থলথলে দেহাবয়ব এবং চলনহীন। এরা এককভাবে বা একসঙ্গে কলোনি করে যখন বসবাস করে তখন দেহ থেকে নিঃসৃত চুনাপাথরের উপাদান পরস্পরের সাথে মিশে গিয়ে উইপোকার ডিবির মতো স্তুপাকারে জমা হয়ে প্রবালের সৃষ্টি করে।

৩। মোহনা (Estuary) : নদী ও সমুদ্রের মিলনস্থলকে মোহনা বলে। মোহনা হচ্ছে একটি আংশিক পরিবেষ্টিত সামান্য লোনা পানির উপকূলীয় এলাকা যেখানে এক বা একাধিক নদীর প্রান্তমুখ এসে মিলিত হয় এবং সাগরের সাথে যার মুক্ত যোগাযোগ রয়েছে। নদী ও সামুদ্রিক পরিবেশের অঞ্চল হচ্ছে মোহনা। লোনা ও স্বাদুপানির মিশ্রণে মোহনা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল প্রাকৃতিক বসতি হিসেবে পরিগণিত। বাংলাদেশের সুদীর্ঘ উপকূলে (প্রায় ৭১০ কিলোমিটার) পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী প্রভৃতি বড় বড় নদী বিস্তৃত মোহনা সৃষ্টি করে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। অনেক মাছের লালনস্থল হিসেবে মোহনা বিখ্যাত হয়ে আছে। অতিথী পাখিরা ভীড় জমায় মোহনায়। লবণাক্ততা ও তলানীজনিত সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে এখানকার জীবকূল নানা অভিযোজনে অভিযোজিত। ফাইটোপ্লাংকটন মোহনার প্রধান প্রাথমিক উৎপাদক।

চিত্র : সামুদ্রিক বায়োম (Marine Biome)

পৃথিবী নামের এই গ্রহের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণি বিস্তৃত। এই অঞ্চলগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য রয়েছে। জীবকূলের (flora and fauna) এই বৈচিত্র্যপূর্ণ বিস্তার (distribution) ও বিসরণ (dispersal) ব্যবস্থা প্রকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর নির্ভরশীল। তাই সুন্দরবনে Royal Bengal Tiger বসবাস করে, কিন্তু অন্য অঞ্চলে তা পাওয়া যায় না। অস্ট্রেলিয়ায় ক্যাঙ্গারু সহজলভ্য হলেও অন্য কোথাও তা মোটেও দেখা যায় না। অনুরূপভাবে নিউজিল্যান্ডের জাতীয় পাখি কিউই পৃথিবীর সকল দেশে পাওয়া যায় না। আবার অস্ট্রেলিয়া ছাড়া পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে হাতি বিস্তৃত ছিল; কিন্তু এখন ভারতীয় হাতি প্রজাতি (*Elephas maximus*) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং আফ্রিকান প্রজাতি (*Laxodanta africana*) সাহারার দক্ষিণে সীমাবদ্ধ।

ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় ৭০ শতাংশ জলভাগ এবং ৩০ শতাংশ স্থলভাগ। স্থলভাগের পরিমাণ দক্ষিণ গোলার্ধ অপেক্ষা উত্তর গোলার্ধে দ্বিগুণেরও বেশি। পৃথিবীর এই বিশাল জলভাগ ও স্থলভাগে বিভিন্ন প্রকার অমেরুদন্ডী ও মেরুদন্ডী প্রাণি পপুলেশন ছড়িয়ে রয়েছে। এগুলোর প্রজাতির সংখ্যা ১২ লক্ষেরও অধিক। প্রাণিভূগোলে মেরুদন্ডী প্রাণিদের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাণিকূলের বর্ণনায় গণ ও প্রজাতির পরিবর্তে পরিবার বা গোত্রের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপের রীতি সর্বজনস্বীকৃত।

প্রাণি প্রজাতির বিস্তৃতি কখনো এক স্থানে গতিহীন নয়। বরং এটি এক গতিময় প্রক্রিয়া। ভৌগোলিক মানচিত্রে মহাদেশ ও দেশের সীমা নির্ধারণের মতো করে এ বিষয়টিকে কখনো উপস্থাপন করা যায় না। পৃথিবীতে প্রাণিকূলের বর্তমান বিস্তৃতির ধারা এবং তা কিভাবে অর্জিত হয়েছে তার কারণ ব্যাখ্যা করা প্রাণিভূগোল চর্চার প্রধান উদ্দেশ্য। এ বিষয়ের সঙ্গে স্থান ও কাল উভয়ই জড়িত। তাই প্রাণিভূগোলে প্রাণিকূলের বিস্তার এবং পরিবেশবিজ্ঞান, বিবর্তন ও ভূত্বকের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

Darwin-এর Origin of species by means of natural selection গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে P.L. Sclater ১৮৫৭ সালে পৃথক সৃষ্টি মতবাদে বিশ্বাসী হয়েও পৃথিবীকে ৬টি পক্ষীকূল অঞ্চলে (Avifaunal region) বিভক্ত করেন। পরবর্তীকালে কতিপয় প্রাণিভূগোলবিদ Sclater প্রদত্ত অঞ্চল বিভাগে কিছু পরিবর্তন আনেন। তবে ১৮৭৬ সালে A.R. Wallace বেজিও ইন্ডিকার পরিবর্তে ওরিয়েন্টাল অঞ্চল ব্যবহারকরত এই শ্রেণিবিন্যাস মেনে নেন। Wallace–এর মতামত Sclater গ্রহণ করেন এবং তার শ্রেণিবিভাগ পরিমার্জিত করেন। বর্তমানে Sclater–এর পরিমার্জিত নিম্নলেখিত প্রাণিভৌগলিক অঞ্চলগুলো সর্বসমর্থিত ও প্রচলিত :

১। প্যালিআর্কটিক অঞ্চল (Palaearctic region)
২। নিআর্কটিক অঞ্চল (Nearctic region)
৩। নিওট্রপিক্যাল অঞ্চল (Neotropical region)
৪। ইথিওপিয়ান অঞ্চল (Ethopian region)
৫। ওরিয়েন্টাল অঞ্চল (Oriental region)
৬। অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল (Australian region)।

নিম্নে পৃথিবীর প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলের নাম, উপ-অঞ্চলের নাম, অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমুহের নাম এবং প্রধান প্রধান প্রাণির নাম দেওয়া হলো।

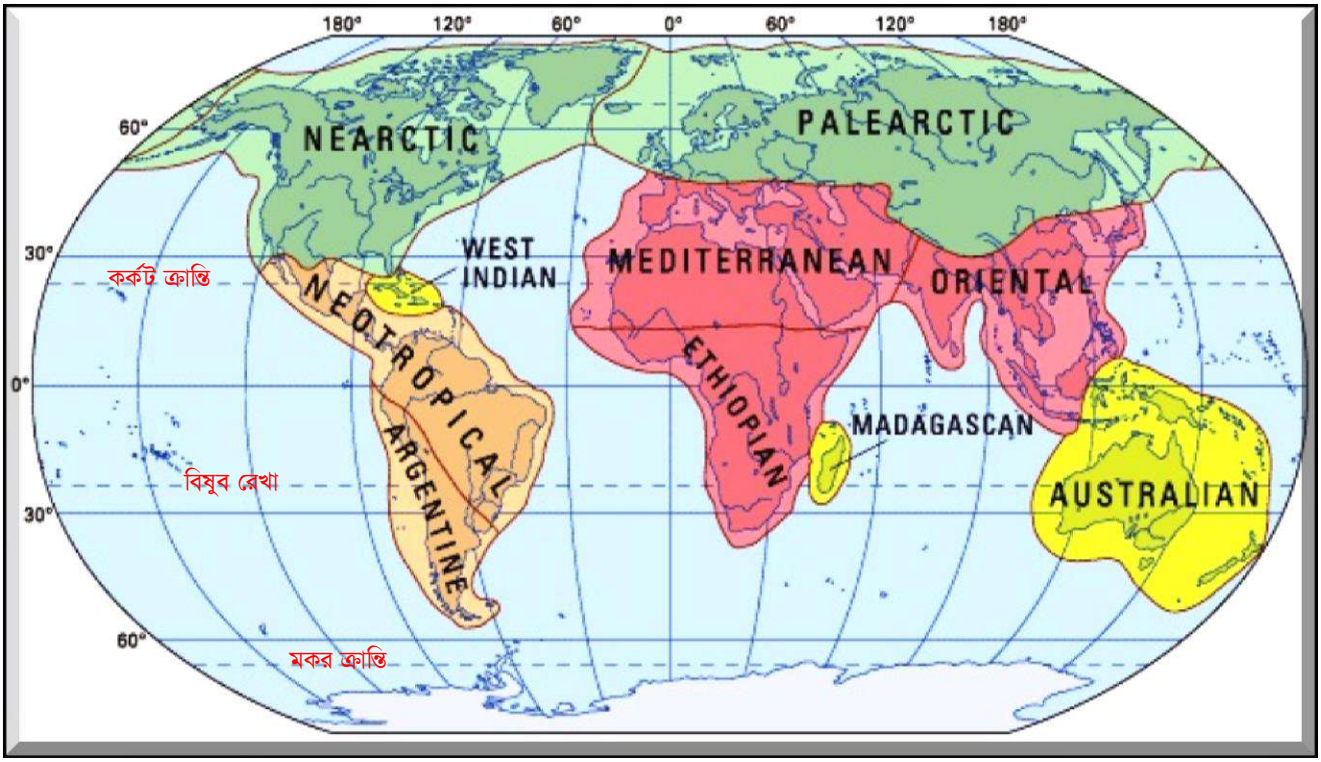

চিত্র : পৃথিবীর প্রাণিভৌগলিক অঞ্চল

প্রাণিভৌগলিক অঞ্চল	উপ-অঞ্চল ও অন্তর্ভুক্ত এলাকার নাম	প্রধান প্রধান প্রাণিদের নাম
১। প্যালিআর্কটিক অঞ্চল (Palaearctic region)	এই সুবৃহৎ অঞ্চলটিকে ৪টি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে : (ক) ইউরোপিয়ান- মধ্য ও উত্তর ইউরোপ। (খ) মেডিটেরানিয়ান- দক্ষিণ ইউরোপ ও আফ্রিকার উত্তরাংশ। (গ) সাইবেরিয়ান- উত্তর ইউরেশিয়া। (ঘ) মাঞ্চুরিয়ান- উত্তর চীন ও জাপান।	হরিণ, ভাল্লুক, ভোঁদর, বলগা হরিণ, উট, গরু, কবুতর, উটপাখি, পেলিকন, প্যাডেল ফিস, সাকার ফিস, ক্যাটফিস, হায়েনা, ঘোড়া, হাতী ইত্যাদি।
২। নিআর্কটিক অঞ্চল (Nearctic region)	এই অঞ্চলটিকে নিম্নলেখিত ৪টি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে : (ক) ক্যালিফোর্নিয়া- উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাংশ। (খ) ।শিলাময় পর্বতশ্রেণি- উত্তরে সাসকেয়ান ও দক্ষিণে ক্যালফোর্নিয় উপকূল। (গ) অ্যালিঘানি- উত্তর আমেরিকার পূর্বাংশ। (ঘ) কানাডিয়ান- উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশ।	ঘোড়া, উট, লামা, আলপাকা, গোয়াস্কা, মেরুশিয়াল, বাইসন, লালহরিণ, শকুন, টার্কিস, হামিংবার্ড, এলিগেটর, কুমির, স্যালমান্ডার, সাকার ফিস, ক্যাটফিস, পেলিকন, ইত্যাদি।
৩। নিওট্রপিক্যাল অঞ্চল (Neotropical region)	এ অঞ্চলটিকে ৪টি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে : (ক) চিলিয়ান- উত্তর-পশ্চিমাংশের স্যান্টিয়াগো উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত। (খ) ব্রাজিলিয়ান- মধ্য আমেরিকার সমভূমি, আমাজান নদীর উপকূলীয় অঞ্চলের বৃষ্টি অরণ্য ও সমভূমি। (গ) মেক্সিক্যান- পর্বতশ্রেণিবহুল এবং উপকূলীয় নিম্নভূমি। (ঘ) আন্টিলিয়ান- কিউবা, হাইতি, জ্যামাইকা, অ্যান্টিগুয়া প্রভৃতি দ্বীপমালা নিয়ে এই পর্বত ও বনভূমিবহুল উপ-অঞ্চল গঠিত।	ভাল্লুক, হরিণ, কুকুর, লামা, অপোসোম, উটপাখি, রিয়া, অস্ট্রিস, সারস, বাজ, প্যাঁচা, হামিংবার্ড, কুমির, কচ্ছপ, কোরাল, বোয়া, ভাইপার, বাইনমাছ, ক্যাটফিস, লংফিস ইত্যাদি।
৪। ইথিওপিয়ান অঞ্চল (Ethopian region)	এ অঞ্চলটিকে ৪টি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে : (ক) পূর্ব আফ্রিকা- দক্ষিণ আরবসহ উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা। (খ) পশ্চিম আফ্রিকা- জাম্বেসি নদীর দক্ষিণ থেকে কঙ্গো নদীর পশ্চিমাংশ। (গ) দক্ষিণ আফ্রিকা- এই উপ-অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমে কালাহারি মরুভূমি, উত্তরে মোজাম্বিক ও উত্তর-পূর্ব লিমপোপো উপত্যকা। (ঘ) মালাগাজি- মাদাগাস্কার ও সন্নিহিত দ্বীপমালা।	গরিলা, শিম্পাঞ্জী, লেমুর, হাতি, ভোঁদর, হায়না, গন্ডার, জিরাফ, জেব্রা, জলহস্তী, উটপাখি, বাজ, শকুন, সারস, ফিঙ্গে, কুমির, ক্যাটফিস, লংফিস ইত্যাদি।
৫। ওরিয়েন্টাল অঞ্চল (Oriental region)	এ অঞ্চলটিকে ৪টি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে : (ক) ভারতীয় উপ-অঞ্চল- পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ ও কুমারিকা অন্তরীপ। (খ) শ্রীলঙ্কা উপ-অঞ্চল- দক্ষিণ ভারতীয় পর্বতমালা হতে নীলাগিরি ও শ্রীলঙ্কা দ্বীপমালা। (গ) ইন্দোচীন উপ-অঞ্চল- দক্ষিণ চীন, বার্মা, থাইল্যান্ড, ফরমোজা ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। (ঘ) মালয় উপ-অঞ্চল- মালয় উপদ্বীপ, মালয়েশিয়া, সুমাত্রা, জাভা ও পিলিপাইন।	রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হাতী, গন্ডার, হরিণ, ওরাংওটান, গরিলা, ভাল্লুক, সিংহ, মেষ, বাদুড়, কবুতর, ব্লুবাড, ময়ূর, বনমোরগ. কুমির, রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি।
৬। অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল (Australian region)	এ অঞ্চলটিকে ৪টি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে : (ক) অস্ট্রো-মালয়ান উপ-অঞ্চল- অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে অবস্থিত নিউগিনি ও পার্শ্ববর্তী দ্বীপমালা নিয়ে গঠিত। (খ) অস্ট্রেলিয়ান উপ-অঞ্চল- অস্ট্রেলিয়া ও তাসমানিয়া নিয়ে গঠিত। (গ) পলিনেশিয়ান উপ-অঞ্চল- প্রশান্ত মহাসাগরীয় ফিজি ও অন্যান্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত। (ঘ) নিউজিল্যান্ড উপ-অঞ্চল- নিউজিল্যান্ড ও পার্শ্ববর্তী দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গঠিত।	ক্যাঙ্গারু, কোয়েলা, ওমব্যাট, প্লাটিপাস, অপোসাস, কাকাতুয়া, টিয়া, এমু, কাঠঠোকরা, কিউই, গেছোব্যাঙ, গিরিগিটি ইত্যাদি।

ভৌগলিক সীমারেখা (Geographical Boundaries) : বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, থাইল্যান্ড, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোচীন, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া এবং সুমাত্রা, জাভা ও ফিলিপাইন এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এ অঞ্চলের উত্তরে নেপালের হিমালয় ও চীনের নানলিঙ পর্বতমালা এবং পলিআর্কটিক অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বে অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল, আর পশ্চিমে ইথিওপিয়ান অঞ্চল অবস্থিত। উল্লেখ্য যে, অঞ্চলটি দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত। এ অঞ্চলটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য নিয়ে গঠিত।

উপ-অঞ্চল (Sub-region) : এ অঞ্চলটিকে ৪টি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে :

(ক) ভারতীয় উপ-অঞ্চল- বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত ও কুমারিকা অন্তরীপ।

(খ) শ্রীলঙ্কা উপ-অঞ্চল- দক্ষিণ ভারতীয় পর্বতমালা হতে নীলাগিরি ও শ্রীলঙ্কা দ্বীপমালা।

(গ) ইন্দোচীন উপ-অঞ্চল- দক্ষিণ চীন, বার্মা, থাইল্যান্ড, ফরমোজা ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ।

(ঘ) মালয় উপ-অঞ্চল- মালয় উপদ্বীপ, মালয়েশিয়া, সুমাত্রা, জাভা ও ফিলিপাইন।

জলবায়ু (Climate) : এ অঞ্চলটিকে সবগুলো অঞ্চলের মধ্যবর্তী অঞ্চল বলেও ধরা হয়। এখানকার আবহাওয়ার বৈচিত্র্যতা উল্লেখযোগ্য। এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সমগ্র অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র অর্থাৎ গ্রীষ্মমন্ডলীয়। সারা বছর বেশি তাপ ও বৃষ্টিপাত এ জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। বেশি আর্দ্রতার কারণে স্যাঁতসেঁতে ভাব, ভ্যাপসা গরম ও গুমোট আবহাওয়া বিরাজ করে। এ অঞ্চলে সূর্য সারা বছর লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে গরম বেশি পড়ে এবং দিন ও রাত্রি সবসময় প্রায় সমান থাকে। এ অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ একই রকম বাৎসরিক তাপমাত্রা ৩০° সেলসিয়াস। উত্তরাংশে তাপমাত্রা উঠানামা করে। এখানে শরৎ ও শীতকালে তাপমাত্রা ১০-১২° সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকে। এখানকার গড় তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াস এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৫০ সে.মি.। শীতকাল শুষ্ক তবে গ্রীষ্মকাল আর্দ্র। পার্বত্য এলাকার আবহাওয়া সিক্ত।

উদ্ভিদকুল (Flora) : ওরিয়েন্টাল অঞ্চলে ৪ ধরনের স্থলজ বায়োম দেখা যায়। যথা-

১। গ্রীষ্মমন্ডলীয় মৌসুমী অরণ্য (Tropical Monsoon Forests) : এ অরণ্যের উদ্ভিদগুলা চওড়া পাতাবিশিষ্ট ও চিরসবুজ। মালয়ান, সিলোনিজ ও ভারতীয় উপাঞ্চলে এমন কিছু বনভূমি দেখা যায়। এতে গভীর সুউচ্চ চির সবুজ অরণ্য সৃষ্টিকারী উদ্ভিদগুলো হলো- জলপাই, কাঁঠাল, জাম, বট ইত্যাদি।

২। পত্রঝরা বনভূমি (Deciduous forest) : ভারত, মায়ানমার এবং ইন্দোচীনে অবস্থিত বিস্তৃর্ণ অঞ্চলজুড়ে রয়েছে এ ধরনের বনভূমি। শাল, পলাশ, কড়ই, চাপালিশ ইত্যাদি এ অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ।

৩। তৃর্ণভূমি (Grassland) : ভারত, মায়ানমার ও ইন্দোচীন অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে এ তৃর্ণভূমি দেখা যায়। এখানে ছোট ছোট ঘাসের মাঝে ঝোপঝাড় ও বৃক্ষ দেখা যায়।

৪। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল (Mangrove forest) : পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন এ অঞ্চলে অবস্থিত। এ অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদের মধ্যে সুন্দরী, গেওয়া, বাইন, কেওড়া, পশুর, গোলপাতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রাণিকুল (Fauna) :

স্তন্যপায়ী (Mammals) : এ অঞ্চলে স্তন্যপায়ীদের মধ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগার (*Panthera tigris*), চিতাবাঘ (*Banis javanica*), হাতি (*Elephas maximus*), ভালুক (*Selemaretos thibetanus*) ওরাংওটাং (*Pongo pygmeus*), বানর (*Macaca mulata*), চিত্রাহরিণ (*Axis axis*) পান্ডা (*Aliuropoda melanoleuca*), উল্লুক (*Hylobates hoolock*), চশমাপড়া হনুমান (*Trachypitheus phayrei*), বনগরু (*Bos gaurus*), কাঠবিড়ালী (*Funambulus palmarum*) প্রভৃতি।

সরীসৃপ (Reptiles) : বোস্তামি কাছিম (*Nilssonia nigricans*), সিলেটি কাছিম (*Pangshura sylhetensis*), ঘরিয়াল (*Gavialis gangeticus*), মিঠাপানির কুমির (*Crocodylus palustris*), বড় কাইট্টা (*Batagur baska*), ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

উভচর (Amphibian) : কুনোব্যাঙ (*Duttaphrynus melanostictus*), সোনাব্যাঙ (*Haplobatrachus tigerinus*), গেছোব্যাঙ (*Rhacophorus fergusonil*), স্যালামান্ডার (*Tylotoriton verocossa*), বাংলাদেশী ঝি ঝি ব্যাঙ (*Zakerana asmati*) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পক্ষিকুল (Birds) : টিয়া (*Psittacula eupatria*), কবুতর (*Columba livia*), শ্বেত কাকাতুয়া (*Cacatua alba*), ফিঙ্গে, কোকিল (*Phaenicopheus sp.*), ময়ূর (*Pavo cristapus*), ব্লু বার্ড, বনমোরগ (*Gallus gallus*), বাবুই, শালিক, মাছরাঙ্গা, দোয়েল (*Copsychus saularis*), পাহাড়ী ঘুঘু (*Columba puncicea*), হলদে পাখি, ডাহুক (*Amaurornis phoenicurus*) ইত্যাদি পাওয়া যায়।

মিঠা পানির মাছ (Freshwater fish) : সবুজ রুই (*Labeo fisheri*), তারা বাইন (*Macrognathus oral*), মেনি (*Nandus nandus*), পাবদা (*Ompok pabda*), পাপতি কই (*Badis badis*), শোল (*Channa barca*), চাপিলা (*Gudusia chapra*), চিতল (*Chitala chitala*) ইত্যাদি।

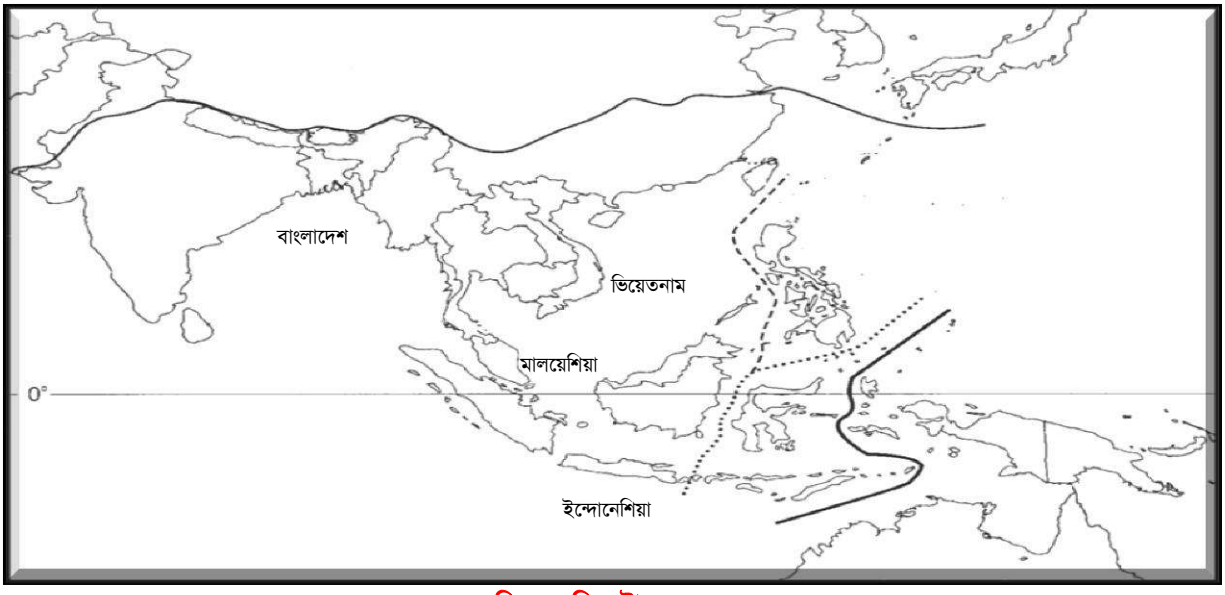

চিত্র : ওরিয়েন্টাল অঞ্চল

বাংলাদেশের বনাঞ্চল (Forest of Bangladesh) : কোনো দেশের উদ্ভিজ্জ, বিশেষ করে অরণ্যের বিতরণ ও বৃক্ষরাজির বৈশিষ্ট্য, সেই দেশের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। অবশ্য নির্দিষ্ট জলবায়ুপূর্ণ দেশে তার ভূ-প্রকৃতি ও মৃত্তিকার পার্থক্য উদ্ভিজ্জের স্থানীয় পার্থক্যর জন্য দায়ী। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব থেকে কোনো জীব নিষ্কৃতি পেতে পারে না। কোনো দেশের উদ্ভিদকুল ও উদ্ভিজ্জের গঠনগত বৈশিষ্ট্য (structural characteristics) নিঃসন্দেহে সেই দেশের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুপূর্ণ বাংলাদেশের উদ্ভিজ্জের উপর ভূ-প্রকৃতি, মাটি ও বৃষ্টিপাতের তারতম্য যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। পলিময় নদীমাতৃক আমাদের এই সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামল দেশ বিস্তৃর্ণ ধান ও পাট ক্ষেতের জন্য প্রসিদ্ধ। উদ্ভিদ ভূগোলবিদদের ধারনা অনুযাযী অতীতে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল শাল কিংবা মিশ্র-চিরহরিৎ অরণ্য ও সাভানা জাতীয় তৃর্ণভূমি। মানুষের বিবিধ কার্যকলাপের ফলে শুধু দুর্গম পাহাড়িয়া অঞ্চল ব্যতীত বর্তমানে দেশের প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ ও উদ্ভিদকূল বহুলাংশে পরিবর্তিত। অবশ্য নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল-বিল ও অন্যান্য জলময় নিবাসে পূর্ব থেকেই প্রচুর জলজ উদ্ভিজ্জ বিদ্যমান।

বাংলাদেশের অরণ্যগুলো বিভিন্ন জেলায় বিস্তৃত হলেও এটা লক্ষণীয় যে, একমাত্র ঢাকা-টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ অরণ্য ব্যতীত দেশের অন্যান্য অরণ্য (যথা- রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট, চট্রগ্রাম-পার্বত্য চট্রগ্রাম, চট্রগ্রাম-কক্সবাজার অরণ্য ও সুন্দরবন) দেশের প্রান্তসীমায় অবস্থিত। স্থানীয় আবহাওয়াগত পার্থক্য (প্রধানত বৃষ্টিপাতের তারতম্য) ও সংশ্লিষ্ট উদ্ভিজ্জ, বিশেষ করে অরণ্যের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের (যেমন- গঠন, অভিযোজন, ঘনত্ব ইত্যাদি) উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে নিম্নলেখিত তিনটি উদ্ভিজ্জ বা উদ্ভিদ ভৌগলিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায় :

১। চিরসবুজ ও অর্ধ-চিরসবুজ বনাঞ্চল (Evergreen and semi-evergreen forest),
২। পত্রঝরা বা পর্ণমোচী বনাঞ্চল (Deciduous forest) এবং
৩। ম্যানগ্রোভ বা উপকূলীয় বনাঞ্চল (Mangrove or Tidal forest)।

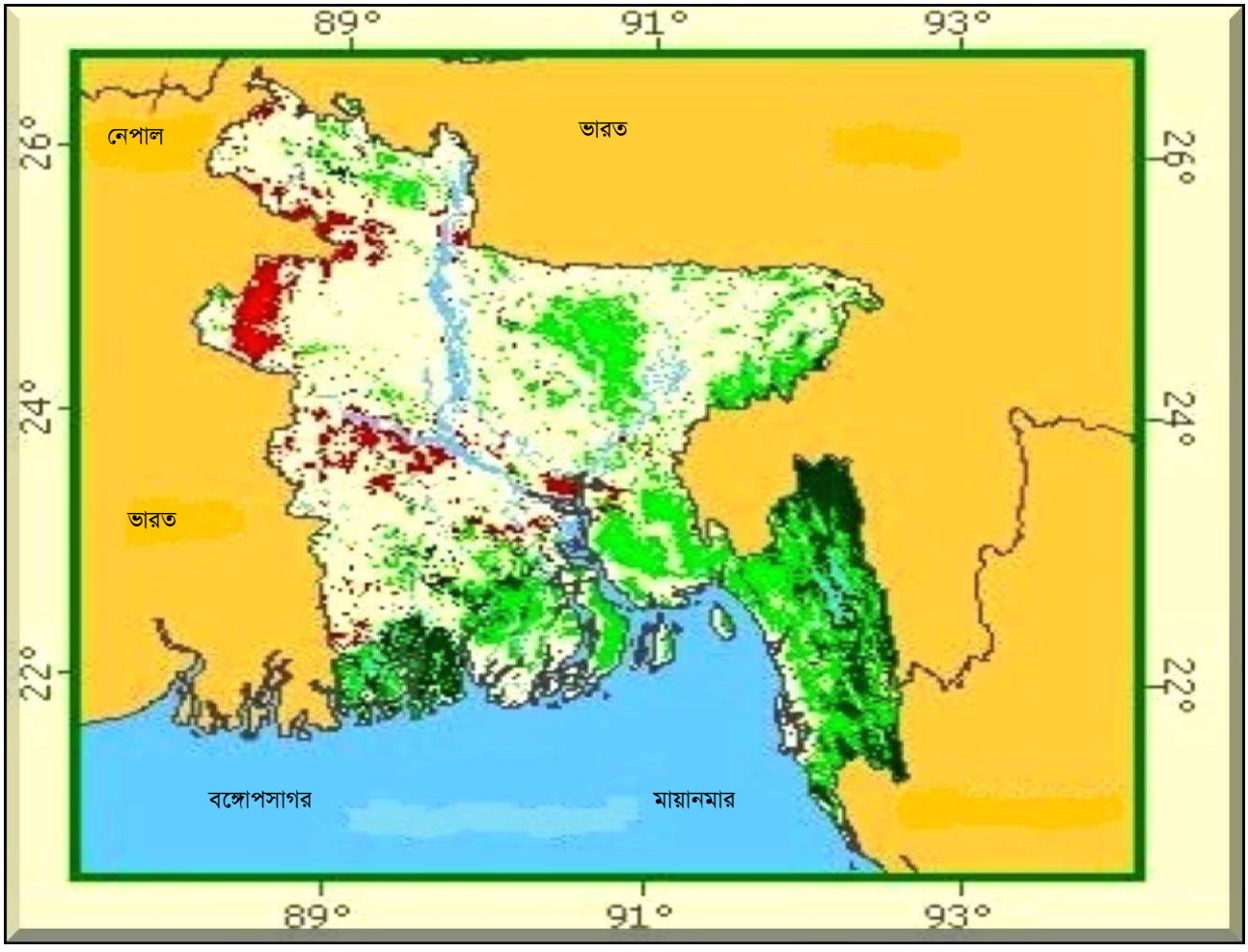

চিত্র : বাংলাদেশের বনাঞ্চল (Forest of Bangladesh)

বিলুপ্তপ্রায় জীবের পরিচিতি (Introduction to Endangered Species) : বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি এবং জলবায়ু বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদের জন্য অত্যন্ত পরম অনুকূল হওয়ায় ছোট্ট এ দেশটিতে রয়েছে উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের এক সমৃদ্ধ ভান্ডার। এখন পর্যন্ত যদিও জাতীয় পর্যায়ে উদ্ভিদ জরিপ করা সম্ভব হয়নি তবে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য থেকে জানা যায় যে পৃথিবীর মোট উদ্ভিদ প্রজাতির প্রায় ২ শতাংশ এখানে জন্মায়। প্রকৃতিগত কারণেই পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এ গাঙ্গেয় বদ্বীপ। বাড়তি জনসংখ্যার চাপে বনভূমি ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। পরিবেশগত কারণে বা আবাসভূমি ধ্বংসের জন্য অতীতে প্রাপ্ত অনেক উদ্ভিদই আর এখন এ অঞ্চলে জন্মাতে দেখা যায় না অথবা অনেক উদ্ভিদ প্রায় বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেছে। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে হয়ত এসব উদ্ভিদ লোকগাঁথা হয়ে দেখা দেবে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণকারী নেতৃস্থানীয় আন্তর্জাতিক অরাজনৈতিক সংগঠন IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural resources) বিশ্বের বাস্তুতান্ত্রিক ও জীববৈচিত্র্যের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষন করে এবং শংকাগ্রস্থ উদ্ভিদ ও প্রাণির তালিকা RED LIST আকারে প্রকাশ করেছে। IUCN বিশ্বের শংকিত (threatened) উদ্ভিদ ও প্রাণি চিহ্নিত করতে কয়েকটি সংজ্ঞা প্রণয়ন করেছে। এগুলো হলো-

১। বিলুপ্ত (Extinct) : যেসব প্রজাতি কিংবা উপ প্রজাতির সর্বশেষ সদস্যটির মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে তাদের বিলুপ্ত প্রজাতি বলে।

২। বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত (Extinct in the wild) : যেসব প্রজাতির জীব তার প্রাকৃতিক বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত কিন্তু গৃহপালিত, বন্দী দশা কিংবা আদি প্রাকৃতিক নিবাস হতে বিচ্ছিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক জীবগোষ্ঠী হয়ে বেঁচে আছে তাদের বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

৩। সংকটাপন্ন (Critically endangered) : যেসব প্রজাতির জীব প্রাকৃতিক পরিবেশ হতে নিকট ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হওয়ার মতো চরম ঝুঁকির মধ্যে আছে বলে মনে করা হয় তাদের সংকটাপন্ন প্রজাতি বলা হয়। এসব প্রজাতির ৮০% আগামী ১০ বছরের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে ধারনা করা হয়।

৪। বিপন্ন (Endangered) : যেসব প্রজাতির জীব অতিবিপন্ন নয় কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে অতিবিপন্ন বা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা দেখা দিয়েছে তাদের বিপন্ন প্রজাতি বলা হয়। এসব প্রজাতির ৫০% আগামী ১০ বছরের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে ধারনা করা হয়।

৫। শংকাগ্রস্থ (Vulnerable) : যেসব প্রজাতির জীব অতিবিপন্ন বা বিপন্ন নয় কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে বিপন্ন বা অতিবিপন্ন বা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা দেখা দিয়েছে তাদের শংকাগ্রস্থ প্রজাতি বলা হয়। এসব প্রজাতির ২০% আগামী ১০ বছরের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে ধারনা করা হয়।

বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ (Extinct plant of Bangladesh) : বাংলাদেশের মাটি অত্যন্ত উর্বর প্রকৃতি হওয়ায় এবং এখানে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় এ দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে অসংখ্য প্রকৃতির উদ্ভিদ জন্মে। এ দেশের বন-জঙ্গল, পাহাড়, তৃর্ণভূমি, জলাভূমি এমনকি বাড়ীর আঙ্গিনা পর্যন্ত উদ্ভিদবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রায় ২৩০০ প্রজাতির শৈবাল, ২৫০ প্রজাতির মস, ২০০ প্রজাতির ফার্ন, ৫ প্রজাতির নগ্নবীজী এবং প্রায় ৩৬০০ প্রজাতির আবৃতবীজী উদ্ভিদকে শনাক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এদেশের উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা আরো অনেক বেশি বলে ধারনা করা হয়। দেশের বিস্তীর্ণ স্থলভাগ ও জলাভূমিতে এসব বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদরাজি পাওয়া যায়। হাজার বছর ধরে এসব উদ্ভিদরাজি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ দেশের মানুষের জীবীকার সাথে জড়িত। আজও এ দেশের মানুষ অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকাংশ উপাদানই উদ্ভিদজগৎ হতে সংগ্রহ করে থাকে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে উদ্ভিদের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপেএ দেশের উদ্ভিদবৈচিত্র্য আজ হুমকির সম্মুখীন। Red Data Book of Vascular Plants of Bangladesh (2001) পুস্তকে ১০৫ প্রজাতির উদ্ভিদকে বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে তালিকাভুক্তি করা হয়েছে। নিম্নের ছকে বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় ১০টি উদ্ভিদের পরিচয় উল্লেখ করা হলো-

ক্রম	স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	উদ্ভিদ প্রকৃতি	উদ্ভিদ স্বরূপ	আবাসস্থান
১।	সাইকাস	*Cycas pectinata*	নগ্নবীজী	গুল্ম	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম
২।	নিটাম	*Gnetum latifolium*	নগ্নবীজী	লতা গুল্ম	চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, সিলেট
৩।	ফার্ন	*Psilotum triquetrum*	টেরিডোফাইট	পরাশ্রয়ী	বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা
৪।	উলট চন্ডাল	*Gloriosa superba*	আবৃতবীজী	বীরুৎ	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম
৫।	তালিপাম	*Corypha taliera*	আবৃতবীজী	বৃক্ষ	ঢাকা
৬।	আগর	*Aquillaria agallocha*	আবৃতবীজী	বৃক্ষ	পাথারিয়া বন-মৌলভীবাজার
৭।	কালোমেঘ	*Andrographis paniculata*	আবৃতবীজী	বৃক্ষ	প্রায় সর্বত্র
৮।	রোটেলা	*Rotala simpliciuscula*	আবৃতবীজী	উভচর উদ্ভিদ	চট্টগ্রাম
৯।	মল্লিকা ঝাঁঝি	*Aldrovanda vesiculosa*	আবৃতবীজী	জলজ	রাজশাহী, পাবনা
১০।	জংলি গোলাপ	*Rosa involucrata*	আবৃতবীজী	গুল্ম	সিলেটের হাওর

- **তালিপাম (Tali Palm) :** বাংলাদেশের বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদের মধ্যে তালিপাম অন্যতম। তালিপাম Palmae গোত্রের একটি তাল জাতীয় উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Corypha taliera* Roxb। ১৯১৯ সালে William Roxburgh এ উদ্ভিদটিকে বাংলার এন্ডেমিক উদ্ভিদ হিসেবে শনাক্ত করেন। এ উদ্ভিদে ৮০ বছর পর্যন্ত কোনো ফুল ফোটে না। এদের জীবনে মাত্র একবার ফুল ফোটে, ফল ধরে এবং এরপর এরা মারা যায়। এদের ফুল ৩ মিটার লম্বা ও পাতা ৬ মিটার প্রশস্থ এবং এটি সপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। The International Union for Conservation of Natural Resources (IUCN) এ উদ্ভিদটিকে বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত (extinct in the wild)' হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। তালিপামের একটি বৃহদাকৃতির বৃক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উপ-উপাচার্যের বাসভবনে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ২০১০ সালে এ গাছে ফুল ফোটে, ফল ধরে এবং প্রাকৃতিকভাবে মারা যায়। এর বীজ থেকে প্রায় ৫০০ চারা সৃষ্টি করা হয় এবং সেগুলো বনবিভাগ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এর কিছু বীজ সিড ব্যাংকে সংরক্ষিত আছে।
- **মল্লিকা ঝাঁঝি (Malacca Jhangi) :** মল্লিকা ঝাঁঝি Droseraceae গোত্রের একটি হার্ব জাতীয় মূলবিহীন, নিমজ্জিত জলজ, সপুষ্পক মাংসাসী উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Aldrovanda vesiculosa* L. এটা প্রায় ১০-৩০ সেন্টিমিটার লম্বা হয় এবং প্রতি পর্বে ৮টি করে পাতা আবর্তকারে সাজানো থাকে। এরা পতঙ্গভূক উদ্ভিদ এবং পাতাগুলো ফাঁদ হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে সর্প্রথম এটি পাওয়া যায় ১৯৭৪ সালে রাজশাহীর পুটিয়া উপজেলোর অন্তর্গত একটি বিল থেকে। পরবর্তীতে চলন বিল থেকেও একবার সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু এরপর আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো অঞ্চল থেকে মল্লিকা ঝাঁঝি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। Red Data Book of Vascular Plants of Bangladesh (2001)-পুস্তকে একে একটি অতি বিপন্ন (critically endangered) জলজ উদ্ভিদ হিসেবে গন্য করেছে। বাংলাদেশে এ উদ্ভিদকে সংরক্ষণের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। একে পাওয়া গেলে জার্মপ্লাজম ব্যাংক স্থপনের মাধ্যমে এক্স-সিটু পদ্ধতিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- **রোটেলা (Rotala) :** রোটেলা Lythraceae গোত্রভূক্ত একটি উভচর, বর্ষজীবী, সরু কাণ্ড বিশিষ্ট হার্ব জাতীয় সপুষ্পক উদ্ভিদ। এর পাতা অতি ক্ষুদ্র ২।৫-৫।০ X ০.৫-২।২ মিলিমিটার আকার বিশিষ্ট হয়ে থাকে।এর বৈজ্ঞানিক নাম *Rotala simpliciuscula* Koehne। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর বেশ কয়েকটি প্রজাতি পাওয়া যায়। আর্দ্র জলাভূমি, ধানক্ষেতে এটি জন্মে অনেক সময় কার্পেটের মতো অবস্থা সৃষ্টি করে। এগুলো ধানক্ষেতের আগাছা হিসেবে গন্য। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে উনবিংশ শতকে এটি আবিস্কৃত হয়েছিল। এখন আমাদের দেশের কোথাও এ উদ্ভিদটি পাওয়া যায় না। তাই Red Data Book of Vascular Plants of Bangladesh (2001)-পুস্তকে একে একটি অতি বিপন্ন (critically endangered) একটি জলজ উদ্ভিদ হিসেবে গন্য করেছে। এ উদ্ভিদটিকে সংরক্ষণের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। একে পাওয়া গেলে ইন-সিটু এবং এক্স-সিটু উভয় পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে। এর বীজ থেকে চারা উৎপাদনের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তালিপাম

মল্লিকা ঝাঁঝি

রোটেলা

ক্ষুদে বড়লা

কোরুদ

চিত্র : বাংলাদেশের কয়েকটি বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ

- **ক্ষুদে বড়লা (Khude barala) :** ক্ষুদে বড়লা বাংলাদেশের একটি এন্ডেমিক উদ্ভিদ। বাংলাদেশের এন্ডেমিক অর্থ হলো বাংলাদেশের বাইরে অন্য কোনো দেশে এখোনো এটি পাওয়া যায়নি। এটি Myristicaceae গোত্রের একটি বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Knema bengalensis* de Wilde। এটি একটি মধ্যম আকারের বৃক্ষ, কান্ডে ক্ষত হলে রক্ত বর্ণের রস বের হতে থাকে। এই উদ্ভিদটি সর্বপ্রথম সংগ্রহ করা হয় ১৯৫৭ সালে কক্সবাজার জেলার ডুলাহাজরা বনাঞ্চল থেকে। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে কক্সবাজার জেলার আপার রিজু বনবিট অফিসের কাছে একটি গাছের সন্ধান পাওয়া যায়। ক্ষুদে বড়লার পুরুষ ও স্ত্রী বৃক্ষ পৃথক। এখনো কোনো স্ত্রী বৃক্ষের সন্ধান পাওয়া যায়নি। Red Data Book of Vascular Plants of Bangladesh (2001)-পুস্তকে একে একটি শংকাগ্রস্থ (vulnerable) উদ্ভিদ হিসেবে তালিকাভূক্তি করা করেছে। আপার রিজু অঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান করে এর স্ত্রী বৃক্ষ আবিস্কার করতে হবে এবং ঐ বৃক্ষ থেকে বীজ সংগ্রহ করে চারা করার মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটাতে হবে অথবা টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে চারা করে এর সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।
- **কোরুদ (Kurud) :** কোরুদ একটি পাম জাতীয় উদ্ভিদ যা চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি এবং সিলেটের গহীন বনে জন্মে থাকে। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Licuala peltata* Roxb। গোত্র Arecaceae। এটি ছোট আকৃতির গাছ, মাত্র ২-৩ মিটার উঁচু হয়ে থাকে। এর পাতা দিয়ে এক রকম ছাতা তৈরি করা হয়, আবার ঘরের ছাউনিও দেয়া হয়। বাংলাদেশের বাইরে মায়ানমার এবং ভারতের বিহার, শণিপুর, ত্রিপুরা, অন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে এটি দ্রুত কমে যাচ্ছে। এ উদ্ভিদের ইন-সিটু ও এক্স-সিটু উভয় প্রকার সংরক্ষণ খুব জরুরি।

বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় প্রাণি (Extinct Animals of Bangladesh) : প্রাণিবৈচিত্র্যে বাংলাদেশ অত্যন্ত সমৃদ্ধ। IUCN Red List Bangladesh, 2015 অনুসরণে বাংলাদেশে মেরুদন্ডী প্রাণির প্রায় ১৩৮ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৫৬৬ (স্থানিক ও পরিযায়ী) প্রজাতির পাখি, ১৬৭ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪৯ প্রজাতির উভচর, ২৫৩ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ রয়েছে; এছাড়া এখানে আছে ক্রাস্টাশিয়া ১৪১ প্রজাতির এবং প্রজাপতি ৩০৫ প্রজাতির। গত ১০০ বছরের রেকড অনুযায়ী ৩১ প্রজাতির মেরুদন্ডী প্রাণি বাংলাদেশ হতে বিলুপ্ত হয়েছে। আরো অনেক প্রজাতির স্তন্যপায়ী, পাখি, সরীসৃপ, উভচর ও মাছ শংকাগ্রস্থ অবস্থায় রয়েছে। নিচের সারণি-১ এ বাংলাদেশের বিলুপ্ত ও শংকিত মেরুদন্ডীদের তালিকা এবং সারণি-২ এ বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় কয়েকটি প্রাণির নাম উল্লেখ করা হলো।

সারণি-১ : বাংলাদেশের বিলুপ্ত ও শংকিত মেরুদন্ডী, ক্রাস্টাসিয়া ও প্রজাপতির তালিকা
(List of extinct and threatened vertebrates, crustaceans and butterflies in Bangladesh) :

প্রাণিগোষ্ঠী	মোট জীবীত প্রজাতির সংখ্যা	আঞ্চলিক বিলুপ্ত প্রজাতির সংখ্যা	শংকিত প্রজাতি			
			অতিবিপন্ন	বিপন্ন	শংকাগ্রস্থ	মোট
স্তন্যপায়ী	১৩৮	১১	১৭	১২	৯	৩৮
পাখি	৫৬৬	১৯	১০	১২	১৭	৩৯
সরীসৃপ	১৬৭	১	১৭	১০	১১	৩৮
উভচর	৪৯	০	২	৩	৫	১০
মিঠাপানির মাছ	২৫৩	০	৯	৩০	২৫	৬৪
ক্রাস্টাসিয়া	১৪১	০	০	২	১১	১৩
প্রজাপতি	৩০৫	০	১	১১২	৭৫	১৮৮
সর্বমোট	১৬১৯	৩১	৫৬	১৮১	১৫৩	৩৯০

সারণি-২ : বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় কয়েকটি প্রাণি (Some endangered animals of Bangladesh) :

ক্রম	বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	শ্রেণি ও গোত্র	প্রাপ্তিস্থান
১।	ঘড়িয়াল	*Gavialis gangeticus*	*Reptilia, Gavialidae*	পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র
২।	মিঠাপানির কুমির	*Crocodylus palustris*	*Reptilia, Crocodylidae*	সুন্দরবন
৩।	রয়েল বেঙ্গল টাইগার	*Panthera tigris*	*Mamalia, Felidae*	সুন্দরবন
৪।	রাজ শকুন	*Sarcogyps calvus*	*Aves, Bucerotidae*	সিলেট, রাজশাহী
৫।	রাজ ধনেশ	*Buceros bicornis*	*Aves, Bucerotidae*	সিলেট
৬।	লজ্জাবতী বানর	*Nycticebus coucang*	*Mammalia, Lorisidae*	সিলেট
৭।	নীলগাই	*Boselaphus tragocamclus*	*Mammalia, Bovidae*	বিলুপ্ত
৮।	উল্লুক	*Hylobates hoolock*	*Mammalia, Hylobatidae*	সিলেট
৯।	হাতি	*Elephas maximus*	*Mammalia, Elephantidae*	সিলেট, চট্টগ্রাম
১০।	শুশুক	*Platanista gangetica*	*Mammalia, Platanistidae*	পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র

- **ঘড়িয়াল (True Gavial) :** ঘড়িয়াল সরীসৃপ শ্রেণিভুক্ত মেরুদন্ডী প্রাণি। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Gavialis gangeticus* Gmelin। এক সময় বাংলাদেশের প্রায় সব নদ-নদীতে ঘড়িয়াল পাওয়া যেত। বর্তমানে কেবল পদ্মা ও যমুনা নদীতে এটি পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ছাড়া ভারত, নেপাল ও মায়ানমারে এরা বিস্তৃত। ঘড়িয়াল পুরুষ ও স্ত্রী পৃথক, পুরুষ ঘড়িয়ালের দৈর্ঘ্য ৬।৫ মিটার। এরা গভীর ও দ্রুত প্রবাহমান পানিতে বাস করে। এদের প্রধান খাদ্য মাছ। নভেম্বর-জানুয়ারী এদের প্রজনন মাস। স্ত্রী ঘড়িয়াল বালুতে তৈরি গর্তে ৩০-৫০টি ডিম পাড়ে। ডিম অনেক বড়। ৩ মাস তা দেয়ার পর ডিম থেকে বাচ্চা হয়। বাংলাদেশে IUCN এর Red Book এ ঘড়িয়ালকে একটি অতি বিপন্ন (critically endangered) প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর চামড়া দামী জুতা ও ব্যাগ তৈরিতে ব্যবহৃত হওয়ায় চোরাকারবারীরা একে বিপন্ন করে তুলেছে। তাছাড়া জেলেদের মাছ ধরার জালে আটকা পড়েও এদের জীবনাবশান ঘটে। একে সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- **মিঠাপানির কুমির (Freshwater Crocodyle) :** মিঠাপানির কুমির একটি সরীসৃপ শ্রেণির প্রাণি। বাংলাদেশে এরা আঞ্চলিকভাবে বিলুপ্ত। শুধুমাত্র বাগেরহাটের খান জাহান আলী (র.) মাজার সংলগ্ন পুকুরে কয়েকটি কুমির আছে। সম্প্রতি ভারত থেকে সাফারি পার্কে পালনের জন্য কয়েকটি কুমির আনা হয়েছে। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Crocodylus palustris*। এদর দৈর্ঘ্য ৫ ফুটের মতো, শক্ত চামড়া দ্বারা আবৃত এবং খাটো ও চওড়া তুন্ড বিশিষ্ট। লেজের উপর দু'সারি খাড়া আঁইশ থাকে যা অগ্রভাগে একসারিতে পরিণত হয়। দেহের বর্ণ ধূসর বা বাদামি তবে তলদেশ সাদা বা হলুদাভ। এরা নদী, পুকুর ইত্যাদি মিঠা পানির জলাশয়ে দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। এরা জোয়ার-ভাটা এলাকায় প্রবেশ করে না। এরা শীতকালে নদীর তীরে গর্তে ২৫-৩০টি ডিম পাড়ে, ৫০-৫৫ দিনে ডেম ফোটে। আন্তর্জাতিকভাবে এটি একটি শঙ্কাগ্রস্থ প্রাণি। একে সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- **রাজশকুন (Red-headed Vulture) :** এটিকে ইংরেজিতে red-headed valture ও বলে। এদের মাথা লাল, এজন্য এদেরকে লাল শকুন বলে। আবার এদের পালক কালো হওয়ায় ভারতে এদেরকে কালো শকুন বলে। পুরুষ ও স্ত্রী পাখির চেহারা অভিন্ন। অন্যান্য শকুনের মতো এরা দলবদ্ধ নয়, একা বা জোড়ায় দেখা যায়। খাবারের তালিকায় মৃত পশুর দেহ। উচু গাছের ডালে পাতা দিয়ে বাসা বানায় এবং একটি মাত্র ডিম পাড়ে। ৪৫ দিনে ডিম ফোটে। এটি বৈজ্ঞানিক নাম *Sarcogyps calvus*। রাজ শকুন বিশ্ব প্রেক্ষাপটে একটি বিপন্ন পাখি। বাংলাদেশে এটি মহাবিপন্ন বলে চিহ্নিত, বাংলাদেশের বাইরে এটি ভুটান, চীন, ভারত, কম্বোডিয়া, লাওস, মালেয়েশিয়া, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুরে পাওয়া যায়। একে IUCN Red List of Threatened Species এ অতিবিপন্ন প্রাণি হিসেবে ঘোষনা করেছে। রাজশকুন সহ সকল ধরনের শকুনের বিলুপ্তির অন্যতম প্রধান কারণ গবাদিগশুর জন্য ব্যবহৃত কৃমিনাশক ডাইক্লোফেন (dichlofen) নামক ওষুধ। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণি আইনে এটি সংরক্ষিত প্রজাতি।

ঘড়িয়াল

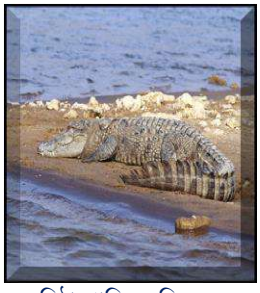
মিঠা পানির কুমির

রাজ শকুন

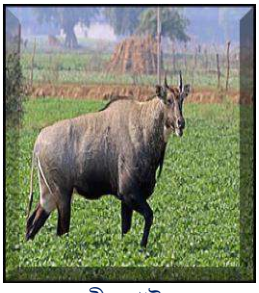
নীল গাই

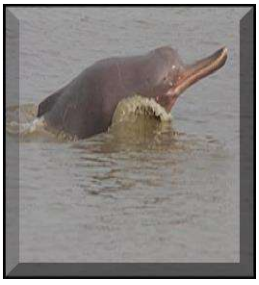
শুশুক

চিত্র : বাংলাদেশের কয়েকটি বিলুপ্তপ্রায় প্রাণি

- **নীলগাই (Nilgai) :** নীলগাই বাংলাদেশের আর একটি বিলুপ্ত স্তন্যপায়ী প্রাণি। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Boselapphus tragocalelus*। এটি এশিয়ার বৃহত্তম অ্যান্টিলোপ জাতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণি। পুরুষের চেয়ে স্ত্রী নীলগাই আকারে একটু ছোট হয়। দেখতে অনেকটা ঘোড়ার মতো। পুরুষেরই শুধু দুটি শিং হয়। স্ত্রী নীলগাই এর লোম হলুদ-বাদামি, আর পুরুষ নীলগাই এর লোম নীল-ধুসর। প্রজননের সময় ছাড়া পুরুষ ও স্ত্রী নীলগাই পৃথকভাবে বিচরণ করে। মহুয়া ফুল এদের খুব পছন্দের। এরা ছোট ছোট পাহাড়ে এবং ঝুপী জঙ্গলপূর্ণ মাঠে চরতে ভালবাসে, ঘন জঙ্গল এড়িয়ে চলে। গাছে ঢাকা উচু-নিচু সমতল বা তৃণভূমিতে যেমনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে তেমনি আবার হুট করে শস্যক্ষেতে নেমে ব্যাপক ক্ষতি করতেও পটু। ১৯৪০ সালে বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া অঞ্চলে নীলগাই পাওয়া যেত। বর্তমানে বাংলাদেশে এটি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে।
- **শুশুক (River Dolphin) :** শুশুক হলো ডলফিন জাতীয় জলজ স্তন্যপায়ী। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Platanista gangetica*। বাংলাদেশে এর দুটি উপপ্রজাতি রয়েছে। এটি বাংলাদেশের পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলি ও হালদা নদী এবং তার শাখা-নদীগুলোতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ছাড়া ভারত ও নেপালের গাঙ্গেয় অববাহিকায় এদের পাওয়া যায়। প্রাপ্ত বয়স্ক শুশুক ২।৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের লম্বা ঠোট, চর্বিযুক্ত শরীর, গোলাকার পেট ও বড় ফ্লিপার থাকে। তবে এরা অন্ধ। এক ধরনের হাইপারসনিক শব্দ দ্বারা এরা চলাচল করে বা শিকার করে। নানা ধরনের মাছ এদর প্রধান খাদ্য। এরা শ্বাস নেবার জন্য মাঝে মধ্যেই পানির উপর হাচির মতো বিশেষ শব্দ করে। একে IUCN Red List of Threatened Species এ বিপন্ন প্রাণি হিসেবে ঘোষনা করেছে। আবাস ও প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস, নদীতে যান্ত্রিক জলযান চলাচল, কৃষিতে কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার এবং নির্বিচারে হত্যা এ নিরহ প্রাণিটির বিলুপ্তির প্রধান কারণ।

জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) : পৃথিবীর বুকে সুদূর অতীতে একদিন জীবনের উন্মেষ ঘটেছিল, তারপর শত শত কোটি বছরের ব্যবধানে জীববৈচিত্র্য গড়ে ওঠে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত কত ধরনের জীবের উৎপত্তি ও বিলুপ্তি ঘটেছে তার সঠিক হিসাব আমাদের নেই। পৃথিবীতে এখন কতকগুলো প্রজাতির জীব রয়েছে তারও কোনো সঠিক তথ্য নেই। তবে ধারনা করা হয় পৃথিবীতে প্রায় ৩০ লক্ষ প্রজাতির জীব ও অণুজীব রয়েছে। এযাবত শনাক্ত হয়েছে মাত্র ১৭.৫ লক্ষ প্রজাতির জীব। প্রকৃতিতে প্রত্যেকটির প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা রয়েছে। জীববৈচিত্র্য হলো জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন আঙ্গিকের পার্থক্য। Bio অর্থ জীব, diversity অর্থ ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য। কাজেই Biodiversity এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে জীববৈচিত্র্য। অধ্যাপক Hamilton এর মতে পৃথিবীর মাটি, পানি ও বায়ুতে বসবাসকারী সব উদ্ভিদ, প্রাণি ও অণুজীবদের মধ্যে যে জিনগত, প্রজাতিগত ও পরিবেশগত (বাস্তুতান্ত্রিক) বৈচিত্র্যতা দেখা যায় তাকেই জীববৈচিত্র্য বলে। UNCED (১৯৯২) এর সংজ্ঞানুযায়ী– পৃথিবীর স্থলজ, সামুদ্রিক ও অন্যান্য বাস্তুতন্ত্র এবং এর সম্পর্কিত সকল স্তরের সদস্য হিসেবে বসবাসকারী জীবদের মধ্যে বিদ্যমান সকল ধরনের বৈচিত্র্যই জীববৈচিত্র্য।

বাংলাদেশে ভাস্কুলার উদ্ভিদের সংখ্যা প্রায় ৩৮৮৬টি। ২০০১ সালের রেড ডাটা বুক অনুযায়ী ১০৬টি বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশে ৬৫০টি প্রজাতির পাখির মধ্যে ১২টি প্রজাতি বিলুপ্ত আর ৩০টি প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। ৩৪টি উভচর প্রাণির মধ্যে ৮টি, ১৫৪ সরীসৃপের মধ্যে ১৪টি প্রায় বিলুপ্তির পথে। যেমন- সুন্দরবন অঞ্চল থেকে বুনোমহিষ, সোয়াম্প হরিণ, হগ হরিণ, গন্ডার, চিতা বাঘ পুরাপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সারাবিশ্বে ১০-৩৭% জীব আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারনা। আগামী ৪০ বছরের মধ্যে ৫০% শৈবাল ধ্বংস হয়ে যাবে। বর্তমানে প্রতি বছরে জীব প্রজাতির বিলুপ্তির হার হলো ২৭০০০ (০.৫%)।

জীব বিলুপ্তির কারণ (Causes of extinction) : বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন জীব বিলুপ্তি হয়েছে। তবে বর্তমানে বিলুপ্তির হার দ্রুততর হচ্ছে। ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ হচ্ছে বিলুপ্তির তালিকা। বিভিন্ন মানব সৃষ্ট ও ইকোলজিক্যাল কারণে জীব প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটছে। কারণগুলো নিম্নরূপ।

১। মানবসৃষ্ট কারণ (Man-made causes) :

(ক) বাসস্থান ধ্বংস (Habitat destruction) : জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির সবচেয়ে বড় কারণ হলো বাসস্থান ধ্বংস। মানুষ খাদ্য, বাসস্থান, শিল্প, সড়ক ও মহাসড়ক, বাধ, কারখানার জন্য বনভূমিসহ নতুন নতুন জায়গা অধিগ্রহণ করার ফলে প্রতি মিনিটে প্রায় ৫০ একর বাসস্থান ধ্বংস হচ্ছে। জলাভূমি ভরাট জলজ প্রজাতি বিলুপ্তির অন্যতম প্রধান কারণ।

(খ) এক্সপ্লয়টেশন (Exploitation) : সম্পদের অতিমাত্রায় আহরণ হলো এক্সপ্লয়টেশন। সম্পদের অতিমাত্রায় আহরণ বহু জীব প্রজাতি বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(গ) অতি মাত্রায় পশুচারণ (Excessive grazing) : তৃণভূমিতে অতিমাত্রায় পশুচারণের ফলে অনেক প্রজাতি বিলুপ্তির পথে।

(ঘ) পলিনেটর ধ্বংস (Destroy the pollinator) : ফসল উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার পেস্টিসাইড ব্যবহারের ফলে কীটপতঙ্গ সহজেই ধ্বংস হয়, যারা গুরুত্বপূর্ণ পলিনেটর। এজন্য পরাগায়ন বাধাগ্রস্থ হয়ে জীব বিলুপ্ত হয়।

(ঙ) পশু শিকার (Animal hunting) : আদিকাল থেকে মানুষ খাদ্যের জন্য শিকার করে আসছে। বাণিজ্যিকভাবে চামড়া, দাঁত, মাংস, ওষুধের জন্য কাঁচামাল, লোম প্রভৃতির জন্য শিকার করে থাকে। অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত শিকারের জন্য প্রতিদিনই আশঙ্কাজনকহারে বিভিন্ন প্রাণির হ্রাস ঘটছে।

(চ) পরিবেশ দূষণ (Environmental pollution) : দূষণ প্রাকৃতিক আবাসকে পরিবর্তন করে ফেলে। কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, শিল্প কারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত পদার্থ, ভারী ধাতু পার্শ্ববর্তী জমি বা জলাশয়ে গিয়ে পড়ছে। এর ফলে ঐ জলাশয়ের মাছ সহ প্রাণিসম্পদ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ ছাড়া বায়ু দূষণের ফলে গ্রিন হাউস ইফেক্ট ও এসিড বৃষ্টি হয়। মোটকথা, পরিবেশ দূষণ জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির একটি বড় কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

২। ইকোলজিক্যাল কারণ (Ecological reasons) :

(ক) পপুলেশনের প্রাচুর্য এবং ভৌগলিক বিস্তৃতি (Abundance of population and geographical expansion) : যেসব প্রজাতির বিস্তৃতি কম তাদের পপুলেশন সাইজও ছোট থাকে। ফলে সহজে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভবনা বৃদ্ধি পায়। যেমন- ট্রপিক্যাল প্রজাতিসমুহ।

(খ) গুচ্ছ বন্টন (Cluster distribution) : স্থানে স্থানে গুচ্ছবন্টিত জীব প্রজাতির সহজে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

(গ) দেহের আকার ও খাদ্যশৃঙ্খলে অবস্থান (Body size and position in the food chain) : দেহের আকার যত বড় হবে তাকে খাদ্য, বাসস্থানসহ নানা প্রতিযোগিতায় তত সমস্যর সম্মুখীন হতে হবে। তাই তার টিকে থাকার সম্ভবনা তত কম হবে। যেমন- হাতি, কুমির ইত্যাদি।

(ঘ) কলোনি গঠনের ক্ষমতা (Ability to form colonies) : যেসব প্রজাতি নতুন পরিবেশে বংশবিস্তারের মাধ্যমে কলোনি সৃষ্টি করতে পারে না সে সব প্রজাতি সহজে বিলুপ্ত হয়।

(ঙ) পরিবেশীয় নিয়ামক (Regulator of the environment) : বাসস্থানে বিভিন্ন পরিবেশীয় নিয়ামকের (যেমন- খাদ্য সরবরাহ, আবহাওয়া পরিবর্তন, সহবিলুপ্তি, যৌন মিলনে স্থায়ী না হওয়া ইত্যাদি) অনির্ধারিত ওঠা-নামার কারণে দুর্লভ ও ছোট ছোট পপুলেশনগুলো টিকে থাকতে পারে না।

(চ) সহবিলুপ্তি (Coexistence) : একটি প্রজাতির বিলুপ্তি হলে তার উপর একান্ত নির্ভরশীল অন্য প্রজাতির জীবেরও বিলুপ্তি ঘটে তখন তাকে সহবিলুপ্তি (coexistence) বলে।

(ছ) প্রাকৃতিক বিপর্যয় (Natural disasters) : ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, দাবানল, হিমবাহ, ভূমিধস, টর্নেডো, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি কারণে সহজেই দুর্লভ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

বিলুপ্তপ্রায় জীব প্রজাতি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (Need for Conservation of Endangered Species) : প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ তার প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ বা প্রাণিকে সংরক্ষণ করে আসছে। যে পরিকল্পনার মাধ্যমে জীবসম্প্রদায়কে বিজ্ঞানভিত্তিক সীমিত ব্যবহার করা হয় এবং পরিবেশের স্বাভাবিক বা অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে পুনঃস্থাপন ও সুরক্ষিত করা হয় তাকে সংরক্ষণ (conservation) বলে। অর্থাৎ বর্তমান জীবকূলের সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিমিত ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একইভাবে ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থাকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (biodiversity conservation) বলে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রথম নীতিমালা হলো "জীবের প্রতিটি ধরনই অনন্য এবং সমাজ ও মানবতার কাছ থেকে ন্যায্যতার দাবিদার"। এই নীতিমালার আলোকে কেবল বিলুপ্তপ্রায় জীব নয়, সকল জীব প্রজাতিকে সংরক্ষণ করা অপরিহার্য। প্রতিটি জীব তার পরিবেশের একটি উপাদান এবং এর সাথে পরিবেশের অন্যান্য নিয়ামকের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাই কোনো একটি প্রজাতির বিলুপ্তিও পরিবেশের উপর কিঞ্চিৎ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এই প্রতিক্রিয়া সম্মিলিতভাবে একদিন পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন এনে দিতে পারে। কাজেই সঠিকভাবে সকল প্রজাতির জীবকে সংরক্ষণ করতে হবে।

আমাদের অসচেতনতার কারণে ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বুক থেকে বহু উদ্ভিদ ও প্রাণি প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আর বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে আছে হাজার হাজার প্রজাতি। এখনই সংরক্ষণের ব্যবস্থা না নিলে এগুলোও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পৃথিবীর ৫০% গ্রীষ্মমন্ডলীয় বনভূমি ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত হয়েছে বা বিলুপ্তির পথে। মানুষ ও প্রাণিজগত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ২,৫০,০০০ উদ্ভিদ প্রজাতির উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন জরিপের তথ্যে জানা যায় যে, প্রতি মিনিটে গড়ে প্রায় ৫০ একর করে বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে। Nature সাময়িকিতে প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে ১৫-৩৭% জীব প্রজাতি বিলুপ্ত হবে। অথচ আগামী দিনের প্রয়োজনে যত বেশি উদ্ভিদ ও প্রাণি জীবন্ত থাকে আমাদের জন্য ততই মঙ্গল।

মনে রাখতে হবে, এমনিতেই কোনো জীব প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার পথে এগোয়নি। এর পেছনে বহু যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে। প্রথমেই ঐ কারণগুলো জানতে হবে। প্রতিটি জীবের নিজস্ব পরিবেশ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে ঐ রকম পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এরূপ প্রতিটি জীবের বংশবিস্তার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে হবে। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করা যায় কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সব রকম অসুবিধা দূর করে এবং সব রকম সুবিধা প্রদাণ করে আমরা বিলুপ্তপ্রায় জীব প্রজাতিগুলোকে পৃথিবীর বুকে কেবল টিকিয়েই রাখবো না, এদের সংখ্যাও বৃদ্দি করবো।

বিলুপ্তপ্রায় জীব সংরক্ষণের গুরুত্ব (The importance of conserving endangered species) :

বিলুপ্তপ্রায় জীব সংরক্ষণের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

১। খাদ্যবিষয়ক গুরুত্ব (Importance of food) : জীববৈচিত্র্য থেকে মানুষের সমস্ত খাদ্য আসে। আদিকাল থেকেই মানুষ খাদ্যের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। আমাদের অধিকাংশ শস্যই এসেছে বুনো উদ্ভিদ থেকে। বুনো প্রজাতিগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেলে ভবিষ্যতে মানসম্পন্ন শস্য উদ্ভিদ আর পাওয়া যাবে না তাই এদের সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন।

২। বাস্তুতান্ত্রিক গুরুত্ব (Ecological importance) : উদ্ভিদ ও প্রাণি সুস্থ বাস্তুতন্ত্রের ভিত গঠন করে। মানুষসহ অন্যান্য সকল প্রাণি তার বেঁচে থাকার সকল উপাদান সংগ্রহ করে বাস্তুতন্ত্র থেকে। বাস্তুতন্ত্রে কোনো একটি প্রজাতির বিলুপ্তি পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এতে বাস্তুতান্ত্রিক প্রবাহ ক্ষুণ্ন হয়। সুতরাং বাস্তুতন্ত্রে সঠিক প্রবাহের জন্য বিলুপ্তপ্রায় জীব সংরক্ষণ করতে হবে।

৩। স্বাস্থ্যবিষয়ক গুরুত্ব (Importance of health) : মানুষের চিকিৎসায় ব্যবহৃত অধিকাংশ ওষুধই আসে উদ্ভিদ ও প্রাণি হতে। কুইনাইন ও পেনিসিলিন ছাড়াও আরও অনেক রোগের ওষুধ ও প্রতিষেধক উদ্ভাবনে জীব সম্প্রদায়ের কাছে মানুষ ঋণী। উদ্ভিদ প্রজাতির মাত্র ৫% থেকে ওষুধিগুণ সম্পর্কে মানুষ জ্ঞাত। অথচ প্রতিদিন প্রায় ১০০ প্রজাতির উদ্ভিদ কোনো না কোনোভাবে বিলুপ্তির গুমকিতে পড়ছে। অনেক ওষুধের উৎস হিসেবে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি ব্যবহৃত হয়। এরা বিলুপ্ত হলে ওষুধ শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভবনা নষ্ট হয়ে যাবে।

৪। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য (For future generations) : সব প্রজাতিকেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য টিকিয়ে রাখতে হবে। কারণ বিলুপ্তপ্রায় জীবের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, যা আমাদের চিকিৎসাবিজ্ঞান ও কৃষিবিজ্ঞানে ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

৫। পর্যটন শিল্প হিসেবে গুরুত্ব (Importance as tourism industry) : বন্যপ্রাণি ও উদ্ভিদের ঐতিহ্যগত নান্দনিক গুরুত্ব রেয়েছে। এ নান্দনিকতাকে ভিত্তি করে অনেক দেশে গড়ে উঠেছে পর্যটন শিল্প। যে দেশে যত বেশি জীববৈচিত্র্য থাকে সে দেশে পর্যটন শিল্পের তত বেশি উন্নতি ঘটে। উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বিলুপ্তপ্রায় জীব রক্ষা করতে হবে। কারণ এটি একদিকে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখবে অন্যদিকে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করবে।

৬। অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic importance) : অনেক বিলুপ্তপ্রায় জীব আজ হুমকির সম্মুখীন। যেমন- বাংলাদেশের ইলিশ মাছ, আমেরিকার স্যামন মাছ ইত্যাদি। এ ধরনের আরো অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণি রয়েছে যেগুলো বিলুপ্ত হলে মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাই মানুষের অর্থনীতিকে সুস্থিত রাখার জন্য বিলুপ্তপ্রায় জীবদের সংরক্ষণ করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ : বিপন্ন, অতিবিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণির একটি চার্ট তৈরি করো এবং ইন্টারনেট থেকে এসব উদ্ভিদ ও প্রাণির শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান (Taxonomical Position) লিখে শিক্ষকের নিকট জমা দাও।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (Biodiversity Conservation) : পৃথিবীতে অসংখ্য জীবসমষ্টির সহাবস্থানের ফলে গড়ে উঠেছে এক অভাবনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ। এখানে রয়েছে অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ ও রয়েছে জানা অজানা নানান প্রকারের প্রাণিগোষ্ঠী। এই অসংখ্য প্রাকৃতিক সম্পদের বিজ্ঞানসম্মত আহরণ, পুন :স্থাপন ও সুরক্ষাদানকে সংরক্ষণ বা কনজারভেশন বলে। একটি পরিবেশীয় অবস্থানের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ উক্ত স্থানের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বকে মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এখন অত্যাবশ্যক হয়ে হয়ে পড়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নিয়ে এগিয়ে এসেছে, শুরু হয়েছে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কাজ। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো হটস্পট নামে পরিচিত।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ তথা কনজারভেশন বলতে বোঝায় বর্তমান জীবকূলের সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিমিত ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার, যাতে করে একদিকে বর্তমান প্রজন্ম তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য ব্যবহার করতে পারবে এবং অপরদিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যেন এমনিভাবে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থা সমুন্নত থাকবে।

বিখ্যাত বাস্তুতত্ত্ববিদ ই পি ওডাম (E. P. Odum, 1971) এর মতে "মানুষের সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনধারা অক্ষুন্ন রাখার জন্য উপযুক্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও বাসযোগ্য পরিবেশ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিতভাবে জীব সম্প্রদায়কে অপচয়, ধ্বংস ও বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রক্রিয়াকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বলে।

জীবের উপযুক্ত বাসস্থান হলো পৃথিবী। মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে জীববৈচিত্র্যের অবদান অপরিমাপযোগ্য। বিবর্তনের হাত ধরে পৃথিবীতে জীববৈচিত্র্যের বিশাল ভান্ডার গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যেমন- ভূমিকম্প, তুষারপাত, আগ্নেয়গিরি, উল্কাপাত ইত্যাদির কারণেও নানা ধরনের প্রজাতির জীব পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছে। আবার মানবসৃষ্ট কারণেও নানা ধরনের জীব পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে বা নিচ্ছে। পরিবেশ অবক্ষয়ের যুগে জীববৈচিত্র্য একটি বহুল আলোচিত বিষয়। সারা পৃথিবীজুড়েই বিজ্ঞানীরা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য জাত উপাদানের স্থিতিশীল ব্যবহারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন।

মানব সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ তার নিজের সুখ সুবিধার জন্য প্রকৃতির প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন করছে। কিন্তু অনেক দেরিতে হলেও মানুষ বুঝতে পেরেছে যে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হলে পক্ষান্তরে মানুষের অস্তিত্বই হুমকির সম্মুখিন হবে। আর এ কারণেই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে IUCN (International Union for the Conservation of Nature and natural resources), WWF (World Wildlife Fund)–এর মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের সহোযোগিতায় ও পরামর্শে বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে (বাংলাদেশসহ) আজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হচ্ছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত সেগুলো হলো-

১। সংরক্ষিত আবাসভূমি স্থাপন (Establishment of protected habitat) : জীববৈচিত্র্যের প্রধান আবাসস্থল হলো বনভূমি। বনাঞ্চলসমুকে যথাযথ সংরক্ষণের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যোক জীব প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। এজন্য সংরক্ষিত বনাঞ্চল যেমন- অভয়ারণ্য (Sanctuary), গেম রিজার্ভ (Game reserve), জাতীয় উদ্দান (National park) ইত্যাদি সৃষ্টি করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ বনাঞ্চলসমুহকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বা বিশ্ব ঐতিহ্য (World Heritage) ঘোষনা করতে হবে। বাংলাদেশের সুন্দরবনকে বর্তমানে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ জলাশয় সমুহকে রামসার এলাকা (Ramsar area) ঘোষনা করতে হবে।

২। পরিকল্পিত অবকাঠামো স্থাপন করা (Installing planned infrastructure) : জীবের আবাসস্থল যাতে ধ্বংস না হয় সেজন্য শিল্পকারখানা, বাড়ীঘর, রাস্তা, বাঁধ ইত্যাদি অবকাঠামোসমুহ পরিকল্পিত উপায়ে স্থাপন করতে হবে।

৩। দূষণরোধ (Contamination) : যেসব দূষণের জন্য জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে সেগুলোকে চিহ্নিত করে প্রতিরোধ করতে হবে।

৪। জৈবিক সম্পদের সীমিত ব্যবহার (Limited use of biological resources) : প্রাকৃতিক জৈবিক সম্পদকে অফুরন্ত না ভেবে সীমিতভাবে ব্যবহার করতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষাবাদের মাধ্যমে প্রয়োজনে জৈবিক সম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে।

৫। বন্যপ্রাণি হত্যা নিষিদ্ধ করা (Prohibit the killing of wildlife) : মাংস, চামড়া, শিং, দাঁত ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন বন্যপ্রাণিকে অবাধে হত্যা করা হচ্ছে। তাছাড়া অনেক বন্যপ্রাণি যেমন- শিয়াল, বেজি ইত্যাদিকে শত্রু মনে করে অযথাই হত্যা করা হয়। এসব বন্যপ্রাণির প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন এবং এদের হত্যা বন্ধ করতে হবে।

৬। জার্মপ্লাজমব্যাংক স্থাপন (Establishment of germplasmbank) : নিম্ন তাপমাত্রায় উদ্ভিদের বীজ বহুবছর সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে জার্মপ্লাজম ব্যাংক বলে। বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতিগুলোকে সংরক্ষণের জন্য জার্মপ্লাজম ব্যাংক স্থাপন করতে হবে।

৭। পুনঃবনায়ন (Reforestation) : যেসব বনভূমি ধ্বংস হয়ে গেছে সেসব স্থানে কাঠ, ফলজ ও ওষুধি গাছের চারা রোপন করে বন্যপ্রাণিদের বাসযোগ্য বনভূমি সৃজন করতে হবে।

৮। মনিটরিং সেল গঠন (Monitoring cell structure) : কার্যকর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে। এরা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের আইন প্রণয়ন, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপাত্ত সংগ্রহ; জীবের শ্রেণিবিন্যাসতাত্ত্বিক তালিকা প্রণয়ন এবং জীববৈচিত্র্যের জীবতাত্ত্বিক তথ্য প্রদাণ করবে।

৯। জনসচেতনতা সৃষ্টি (Creating public awareness) : জীববৈচিত্র্যের বাস্তুতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় বিধান সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে। এজন্য গণমাধ্যমে এ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা হতে সকল স্তরে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়টি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

উপকূলীয় বনাঞ্চল (Costal Forest) : বাংলাদেশের পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিক স্থল বেষ্টিত কিন্তু দক্ষিণ দিকে রয়েছে উন্মুক্ত বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলো, বিশেষ করে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা সরাসরি সাগর পাড়ে দাuড়িয়ে আছে। এছাড়াও সাগরবক্ষে সন্দীপ, হাতিয়া, মহেশখালী, উড়িরচর, চর কুকড়ি-মুকড়িসহ অসংখ্য ছোট-বড় দ্বীপ ও চর এলাকা রয়েছে। সম্পূর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল প্রায় ৭১০ কিমি. লম্বা।

প্রাকৃতিকভাবে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। নদীমাতৃক দেশ হিসেবে দেশটির পরিচিতি রয়েছে। দেশটির বেশিরভাগ অঞ্চল স্থল দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকলেও দক্ষিণ অঞ্চল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ও বঙ্গোপসাগরে বিস্তৃর্ণ অঞ্চল। এ কারণে এখানে প্রতিবছর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হানা দিয়ে থাকে, এর মধ্যে ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস অন্যতম। সিডর, নার্গিস ইত্যাদি বড় ধরনের ঘটনায় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল সবচেয়ে বেশি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্যতম উপায় হচ্ছে উপকূলীয় বনাঞ্চল ও সবুজ বেষ্টনি তৈরি করা। বাংলাদেশের বিস্তৃর্ণ এলাকাকে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা করার জন্য একটি অন্যতম উপায় হলো উপকূলীয় বনাঞ্চল সৃষ্টি করা।

উপকূলীয় বনাঞ্চল উপযোগী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of plants suitable for coastal forests) : বিশেষ পরিবেশগত কারণে উপকূলীয় বনাঞ্চলে অবস্থিত উদ্ভিদের রয়েছে অভিযোজনের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। নিম্নে এসব বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো-

১। উপকূলীয় বনাঞ্চলের উদ্ভিদ বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী বীরুৎ, গুল্ম ও বৃক্ষ হয়ে থাকে।

২। অধিকাংশ উদ্ভিদে বীজের জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম ঘটে। অর্থাৎ গাছে ঝুলানো থাকা অবস্থায় ফলের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়।

৩। উপকূলীয় বনাঞ্চলে দৈনিক দুবার জোয়ার-ভাটা দ্বারা প্লাবিত হয়। জোয়ারের সময় উদ্ভিদগুলো আংশিকভাবে পানিতে ডুবে গেলেও উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় কাজে কোনো প্রকার সমস্য হয় না। কারণ এদের রয়েছে অদ্ভুত এক অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য। এসব উদ্ভিদের মাটির নিচের আনুভূমিক মূল থেকে অনেকগুলো মূল মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসে। এসব মূলকে শ্বাসমূল বা নিউম্যাটোফোর (Pneumatophores) বলে। এসব শ্বাসমূলের মাধ্যমে এরা বায়ু থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে।

৪। অনেক উদ্ভিদে সুগঠিত ঠেসমূল উৎপন্ন হয়। যেগুলো গাছকে সোজাভাবে দাuuuড়াতে সাহায্য করে।

৫। অধিকাংশ উদ্ভিদের পাতা পুরু এবং চিরহরিৎ, ক্ষুদ্র এবং চামড়ার মতো মনে হয়।

৬। এসব উদ্ভিদের পাতার পৃষ্ট মোম অথবা রোমে অচ্ছাদিত থাকে। পাতার পত্ররন্ধ্র নিমজ্জিত এবং নিম্নতলে বিদ্যমান থাকে। এতে করে প্রস্বেদনের পরিমাণ হ্রাস পায়।

৭। পাতার অভ্যান্তরে লবণাক্ততার পরিমাণ শুষ্ক ওজনের ১০-৫০ ভাগ। মেসোফিল কলায় প্যালিসেডের পরিমাণ বেশি থাকে।

৮। এধরনের উদ্ভিদের মূলের ভেতরে বড় বড় বায়ুকুঠুরি থাকে।

৯। লবণাক্ততা বাড়ার সাথে সাথে যৌন জননের ঘটনা কমে যায়।

১০। এদের বীজ হালকা হওয়ায় পানিতে ভাসতে পারে।

উপকূল এলাকায় বনাঞ্চল তৈরির প্রয়োজনীয়তা (Need to create forests in coastal areas) : বৃক্ষ মানুষের পরম বন্ধু। বৃক্ষহীন জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। পৃথিবীর পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় অন্যতম উপাদান ও শক্তি হচ্ছে বৃক্ষ। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান সামগ্রী, শিক্ষা উপকরণ, রোগ নিরাময়ের ওষুধ, ইকো-টুরিজম সব কিছুতেই রয়েছে বৃক্ষের অবদান। বৃক্ষ জীব ও জগতের প্রকৃত বন্ধু, জীবনের স্পন্দন, অর্থনৈতিক শক্তি, ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছাস-দূর্যোগ মোকাবেলায় শক্তিশালী হাতিয়ার। পরিবেশের ভারসাম্য অব্যাহত রাখতে এবং আমাদের মৌলিক চাহিদা ও শিল্পগত উন্নয়নে বৃক্ষের অবদান অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে বঙ্গোপোসাগর অবস্থিত। আর এ সাগর সংলগ্ন প্রায় ৭১০ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে উপকূল। উপকূলীয় এলাকায় বেশ কয়েকটি বনাঞ্চল বিদ্যমান থাকলেও অনেক এলকা এখনও উন্মুক্ত অবস্থায় আছে। তাই জরুরী ভিত্তিতে এসব অঞ্চলে বনাঞ্চল তৈরি করা প্রয়োজন। উপকূলীয় বনাঞ্চল নিম্নলেখিত গুরুত্বগুলো বহন করে-

১। উপকূলীয় বনাঞ্চল সামুদ্রিক ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দূর্যোগ হতে জানমাল রক্ষা করে।

২। এদের শ্বাসমূল ভূমি ক্ষয় রোধ করে।

৩। সামাজিক বনায়ন দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

৪। বনায়ন বন ও বনাঞ্চল সংরক্ষণ করে, বনজ সম্পদ বৃদ্ধি করে এবং প্রকৃতিকে সবুজ ও শীতল রাখে।

৫। বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তু ও পাখির অভয়ারণ্য সৃষ্টি করে।

৬। গহীন সুন্দরবন পৃথিবী বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে আশ্রয় প্রদাণ করে ও সংরক্ষণ করে।

ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের শ্বাসমূল

সুন্দরী গাছ *(Heritiera fomes)*

গোলপাতা *(Nypa fruticans)*

সুন্দর বনের হরিণ

উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী (Costal Green Belt) : প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে উপকূল বরাবর এবং প্রধান বায়ু প্রবাহের সমকোণে রোপিত একফালি শাখাপ্রশাখা সমৃদ্ধ বৃক্ষকে (বনায়ন) বায়ু প্রবাহ রোধক বা সবুজ বেষ্টনী বলে। আর যে একফালি ভূ-খন্ডের উপর সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা হয় সেই ভূ-খন্ডকে আশ্রয় ফালি (shelter belt) বলে।

সবুজ বেষ্টনী হিসেবে চিরহরিৎ বৃক্ষের ১৫০ ফুট উচু প্রজাতিগুলো অধিক কার্যকর। তবে আশ্রয় ফালির শুধু কেন্দ্রাংশে দিয়ে সর্বোচ্চ বৃক্ষ করতে হয়।এবং তার উভয় পর্শ্বে ক্রমশকম উচ্চতার বৃক্ষ, গুল্ম, উপগুল্ম এবং তৃর্ণ রোপন করতে হয়।এর ফলে বনের ক্যানোপির (anopyc) প্রস্থচ্ছেদ ত্রেকোণাকার হয়। এখানে সারিগুলোতে ২ তেকে ৫ মিটার দুরে দুরে বৃক্ষ আর ১ থেকে ১।৫ মিটার দুরে দুরে গুল্ম রোপণ করতে হয়। এমন আশ্রয় ফালি ৫গ ফুট থেকে ২০০ ফুট চওড়া হয় এবং সেটা নির্ভর করে জলবায়ুগত অবস্থা, মাটির প্রকৃতি এবং বাতাসের বেগের উপর। এছাড়া সবুজ বেষ্টনীর দৈর্ঘ্য হবে প্রয়োজন মতো।

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পূর্ব উপকূল অঞ্চল প্রতিবছরই জলোচ্ছাস এবং উপকূলীয় ভাঙ্গনের সম্মুখিন হয়ে থাকে। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল প্রলয়ংকারী ঘুর্ণিঝড়ের পর সরকার দেশের উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে উপকূল বরাবর সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার প্রকল্প হাতে নেয়। এ প্রকল্প অনুসারে ঘুর্ণিঝড় প্রবন এলাকাসমুহের বাuধের ঢালে, রাস্তার পার্শ্বে, সমুদ্র তটরেখা বরাবর বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে সবুজবেষ্টনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

সবুজ বেষ্টনীর উপযোগী উদ্ভিদ হলো সুন্দরী, কেওড়া, বাইন, পশুর, নারিকেল, সুপারি, গাব, কেয়া, গোলপাতা, প্রভৃতি। BFRI-এর মতে, লবন সহিষ্ণু বাuশ, তাল ও নারিকেল গাছ ঘুর্ণিঝড় প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

সবুজ বেষ্টনীর বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য (Characteristics a green belt of trees) :

১। উপকূলীয় অঞ্চল জোয়ারের পানিতে নিয়মিত সিক্ত হয় এবং পানি লবণাক্ত। একটু উচু জায়গায়ও মাঝে মাঝে জোয়ারের পানি ঢুকে যায়। কাজেই লবণাক্ত পানিতে জন্মাতে পারে এমন বৃক্ষ প্রজাতি সবুজ বেষ্টনীর জন্য নির্বাচন করতে হবে।

২। মূলতন্ত্রের মাধ্যমে মাটি ধরে রাখতে পারে এমন প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে।

৩। ঝড়ের ঝাপটায় ভেঙ্গে না যায় বা মূলৎপাটিত না হয় এমন প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে।

৪। সবুজ বেষ্টনীর বৃক্ষ থেকে খাদ্য, পশুখাদ্য, পানীয়, জ্বালানি, কাঠ ও অণ্যান্য অর্থকারী সম্পদ প্রাপ্তির সুবিধা থাকতে হবে।

উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর প্রয়োজনীয়তা (Requirements for coastal green belt) :

১। সবুজ বেষ্টনী সমুদ্র থেকে আসা জলোচ্ছ্বাসকে প্রাথমিকভাবে প্রতিহত করে এবং জেলোচ্ছ্বাসের গতি, প্রচন্ডতা ও উচ্চতা বহুলাংশে কমিয়ে দেয়।

২। জলোচ্ছ্বাসকালীন ভাটার টানে মানুষ, পশু ও অন্যান্য সম্পদ ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

৩। ঝড়ের গতিবেগ, ঝাপটা ও ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

৪। বাসস্থান গভীর পানিতে ডুবিয়ে গলে বৃক্ষের উপর উঠে মানুষ আত্মরক্ষা করতে পারে।

৫। সবুজ বেষ্টনীতে লাগানো বৃক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় জ্বালানি, কাঠ, খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী পেতে পারে।

৬। সবুজ বৃদ্ধি ও বনাঞ্চল সংরক্ষণে সবুজ বেষ্টনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৭। বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং অন্যান্য বনকে রক্ষা করে।

৮। গরান. গেওয়া ইত্যাদির কাঠ নিউজপ্রিন্ট কাগজের কাচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৯। সবুজ বেষ্টনী বিভিন্ প্রকার জীবজন্তু ও পাখির অভয়ারণ্য সৃষ্টি করে।

১০। মোহনা অঞ্চলে উপকূলীয় উদ্ভিদ অনেক সামুদ্রিক জীবগোষ্ঠীর জন্য পুষ্টির উৎস হিসেবে কাজ করে।

১১। সর্বোপরি উপকূলীয় ইকোসিস্টেমকে সুসংহত রাখে।

সুন্দরী

কেয়া

সুপারি

বাইন

কেওড়া

চিত্র : উপকূলীয় অঞ্চলের কয়েকটি উল্লেখযেগ্য উদ্ভিদ

চিত্র : উপকূলীয় অঞ্চলে বাশ, নারিকেল ও তাল গাছের বেষ্টনী

স্বস্থানে সংরক্ষণ (*In-situ* conservation) : Conservation of Biological Diversity (CBD, 2005)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, স্বস্থানে সংরক্ষণের অর্থ হচ্ছে কোনো বিলুপ্তপ্রায় জীব প্রজাতিকে (উদ্ভিদ বা প্রাণি) তার নিজস্ব প্রাকৃতিক জন্মস্থানে অপরিবর্তিত অবস্থায় সংরক্ষণ করাকে স্বস্থানে সংরক্ষণ (*In-situ* conservation) বলে। সাধারণত বিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণে এ পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রয়োগ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এ পদ্ধতিতে ঐ জীবের আবাসস্থলকেই সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়। এটি জীব প্রজাতি সংরক্ষণের একটি প্রাচীন ও সহজ পদ্ধতি। এতে একটি সম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে বিলুপ্তপ্রায় জীব স্বাভাবিক সহজাত বসবাস ও বংশবৃদ্ধি করতে পারে।

সুন্দরবনের কর্দমাক্ত, লবণাক্ত ও সিক্ত পরিবেশে সুন্দরী গাছ জন্মে থাকে। কাজেই সুন্দরী গাছকে সুন্দরবনের মূল বাসস্থান তথা ঐ পরিবেশতন্ত্রে সংরক্ষণ করাই হলো স্বস্থানে সংরক্ষণ বা ইন-সিটু কনজারভেশন এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

স্বস্থানে সংরক্ষণ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ (Advantages of *In-situ* conservation methods) :

১। কোনো প্রজাতি সংরক্ষণের উত্তম উপায় হলো যে বাসস্থানে ইহা জন্মে সেই বাসস্থানকে যথাযথভোবে সংরক্ষণ করা। এর ফলে উক্ত প্রজাতির সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রাণিকূলও সংরক্ষিত হয়।

২। উদ্ভিদ ও প্রাণি নিজস্ব পরিবেশে থাকার ফলে তাদের অভিযোজনগত সমস্য থাকে না।

৩। এ ধরনের সংরক্ষণে অর্থ, শ্রম ও সময়ের ব্যয় খুবই কম হয়।

৪। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকায় খাদ্যশৃঙ্খলের ব্যাঘাত ঘটে না।

৫। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিবর্তন প্রক্রিয়া চালু থাকে।

৬। অনেক সময় বীজকে শুকিয়ে বীজ-ব্যাংকে রাখলে বীজের অঙ্কুরোগদগম ক্ষমতার বিনাশ ঘটে, সেক্ষেত্রে স্বস্থানে সংরক্ষণ খুবই কার্যকরী।

৭। যে অঞ্চলে এখনো অনেক প্রজাতি অনাবিষ্কৃত রয়েছে সে অঞ্চলেও স্বস্থানে সংরক্ষণ পদ্ধতি আবশ্যক।

৮। এ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত জীব পরিবেশের পরিবর্তন এবং স্থানীয় রোগের পরজীবীর সাথে অভিযোজিত হতে পারে।

৯। এ পদ্ধতিতে জীব সংরক্ষণের কোনো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হয় না বলে খরচ অনেক কম হয়।

১০। যে সমস্ত উপাদান প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর সেগুলোকে এ পদ্ধতিতে দূর করা হয় এবং প্রজাতিকে তার নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্মাতে সহায়তা করা হয়।

১১। এ পদ্ধতির মাধ্যমে অনেক গৃহপালিত কিংবা স্থানীয় জাতকে তাদের নিজস্ব পরিবেশে সংরক্ষণ করা যায়।

১২। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে জীববৈচিত্র্য হুমকীর সম্মুখিন হলেও স্বস্থানে সংরক্ষণ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত জীবগুলো অনেকসময় রক্ষা পায়।

স্বস্থানে সংরক্ষণ পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of *In-situ* conservation methods) :

১। এ পদ্ধতিতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বিশাল আয়তনের ভূখন্ডের প্রয়োজন হয়।

২। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের কৃষিজমি, কলকারখানা, বাসস্থান, রাস্তা ইত্যাদি স্থাপনের জন্য প্রচুর জমির প্রয়োজন হয় বলে বিশাল আয়তনের ভূখন্ড পাওয়া দুরহ হয়ে উঠে।

৩। সংরক্ষিত এলাকা থেকে জীববৈচিত্র্যের অবৈধ পাচার নিয়ন্ত্রণ করা অনেকসময় বেশ কঠিন হয়ে পড়ে।

৪। সংরক্ষিত এলাকাতে বাস্তুতান্ত্রিক পূর্বাবস্থা (ecological restoration) ফিরিয়ে আনা এবং বিদেশী প্রজাতির জীবদের উচ্ছেদ করা বেশ জটিল হয়ে উঠে।

৫। ভূমিধস, ভূমিক্ষয় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়প্রবণ এলাকায় এ পদ্ধতি ততটা উপযোগী নয়।

৬। যেসব প্রজাতির যৌন প্রজননের ক্ষমতা নেই এবং যারা অতিবিপন্ন অবস্থায় আছে তাদের এ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা বেশ কঠিন।

স্বস্থানে সংরক্ষণের কয়েকটি উদাহরণ (Some examples of *In-situ* conservation) :

১। অভয়ারণ্য (Wildlife sanctuary) : যে রক্ষিত এলাকায় প্রবেশ, বন্যপ্রাণি ধরা, মারা, গুলি ছোড়া বা ফাঁদ পাতা নিষিদ্ধ এবং মুখ্যত বন্যপ্রাণির নিরাপদ বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ (যেমন- মাটি, পানি, অণুজীব) সংরক্ষণে ব্যবস্থাপনা গৃহীত হয় সেটি অভয়ারণ্য নামে পরিচিত। সরকার জীববৈচিত্র্য বা পরিবেশগত গুরুত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করে দেশের যে কোনো এলাকা বা অংশবিশেষকে বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য, পাখি অভয়ারণ্য, জলাভূমি নির্ভর অভয়ারণ্য বা ক্ষেত্রবিশেষ মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে অভয়ারণ্যের ভেতর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গবেষণা কাজ চালানো যায়। বাংলাদেশে প্রায় ৩০টির মতো অভয়ারণ্য (পাখি বা বন্যপ্রাণি বা উভয়ই) রয়েছে। UNESCO ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনস্থ তিনটি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্যকে ৭৯৮ নম্বর Ôবিশ্ব ঐতিহ্য বা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ (World Heritage)' তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে এবং ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সরকার সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য অঞ্চল বা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করে।

২। জাতীয় উদ্যান (National park) : জাতীয় উদ্যান হচ্ছে মনোরম ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত তুলনামূলক বড় এলাকা যার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণকে শিক্ষা, গবেষণা ও বিনোদনের অনুমতি প্রদাণ এবং উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণির প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সুন্দর নয়নাভিরাম দৃশ্য সংরক্ষণ করার উদ্দেশে ব্যবস্থাপিত রক্ষিত এলাকা। জাতীয় উদ্যান ঘোষণার ক্ষেত্রে সরকারকে বন ও বন্যপ্রাণি ব্যবস্থাপনার জাতীয় নীতিমালা বা মহাপরিকল্পনা, ভূমির গাঠনিক বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব, বাস্তুসংস্থান ও পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

৩। ইকোপার্ক (Ecopark) : ইকোলোজিক্যাল পার্ক-এর সংক্ষিপ্তরূপ হলো ইকোপার্ক। প্রাকৃতিক পরিবেশকে সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রেখে এবং সেখানকার জীববৈচিত্র্যের কোনো প্রকার ক্ষতি না করে চিত্তবিনোদনের সব ব্যবস্থা করা হয় ইকোপার্কে। এটি এমন একটি এলাকা যেখানে পর্যটকরা প্রকৃতি-বান্ধব পরিবেশে নান্দনিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবে এবং একই সাথে এলাকার জীববৈচিত্র্যও সংরক্ষিত হবে। বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি এলাকাতে ইকোপার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ইকোপার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য (Purpose of setting up Eco Park) : ১। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ২। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ৩। বিলুপ্ত ও দূর্লভ প্রজাতি সংরক্ষণ, ৪। বিশেষ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের ব্রিডিং ও উন্নয়ন, ৫। পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষে চিত্তবিনোদনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও অবকাঠামো নির্মাণ, ৬। স্থানীয় বাসিন্দাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এরং ৭। শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪। সাফারি পার্ক (Safari park) : সাপারি পার্ক হলো এক ধরনের সংরক্ষিত বনভূমি যেখানে বন্য প্রাণিরা (হিংস্র প্রাণিসহ) নূন্যতম প্রাকৃতিক পরিবেশে রক্ষিত থাকে, মুক্তাবস্থায় বিচরণ করে এবং দর্শনার্থীগণ বিশেষ বাহনে অবরুদ্ধ থেকে তাদের গতিপ্রকৃতি অবলোকন করে আনন্দ লাভ করে সেই পার্ক হলো সাফারি পার্ক। এই পার্কে দেশের নিজস্ব এবং বিদেশ থেকে আনা বন্যপ্রাণি প্রাকৃতিক পরিবেশে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হয়। প্রাণিরা এখানে মুক্তভাবে ব্রিডিং করতে পারে। বাংলাদেশে দুটি সাফারি পার্ক আছে, যথা- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, ডুলহাজরা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, গাজীপুর।

সাফারি পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য (Purpose of setting up a safari park) : ১। ইকোট্যুরিজম, ২। বিনোদন, ৩। সংরক্ষণ ও গবেষণা, ৪। প্রধান প্রধান বন্যপ্রাণি যেমন- বাঘ, সিংহ, হরিণ এবং অন্যান্য তৃণভোজী বন্যপ্রাণি এ পার্কে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, ৫। বাংলাদেশে দেখা যায় না বা বাংলাদেশ হতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এমন বন্যপ্রাণি পর্যায়ক্রমে সাফারি পার্কে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং ৬। জনগণের মধ্যে সংরক্ষণ সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৫। গেম রিজার্ভ (Game reserve) : গেম রিজার্ভ বলতে এমন একটি এলাকা বোঝায় যেখানে জীবসমুহ সুরক্ষিত থাকবে এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিকার করা যাবে। বাংলাদেশের একমাত্র গেম রিজার্ভটি হলো কক্সবাজার জেলার নাফ নদীর তীরে অবস্থিত টেকনাফ গেম রিজার্ভ। বিশেষত হাতি সংরক্ষণের জন্য ১১,৬১৫ হেক্টরের অঞ্চলটি ১৯৮৩ সালে গেম রিজার্ভ ঘোষিত হয়। বর্তমানে এটি বন্যজীব অভয়ারণ্য।

চিত্র : মাধবকুন্ড ইকোপার্ক

চিত্র : সীতাকুন্ড ইকোপার্ক

চিত্র : বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক, গাজীপুর

চিত্র : বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক, কক্সবাজার

ক্রম	ইকোপার্কের নাম	অবস্থান	আয়তন (একর)	প্রতিষ্ঠাকাল
১।	সীতাকুন্ড ইকোপার্ক	চট্টগ্রাম	১৯৯৬	১৯৯৯
২।	মধুটিলা ইকোপার্ক	শেরপুর	২২০	১৯৯৯
৩।	মাধবকুন্ড ইকোপার্ক	মৌলভীবাজার	৬৩৪	২০০০
৪।	মুরাইছড়া ইকোপার্ক	মৌলভীবাজার	৮৩০	২০০০
৫।	বাঁশখালী ইকোপার্ক	চট্টগ্রাম	২৯৬৪	২০০৩
৬।	সাতছড়ি ইকোপার্ক	হবিগঞ্জ	৬০০	২০০৫
৭।	কুয়াকাটা ইকোপার্ক	পটুয়াখালি	৫৬৬১	২০০৬

অন্যস্থানে সংরক্ষণ (*Ex-situ* Conservation) : Conservation on Biological Diversity (CBD, 2005)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, অন্যস্থানে সংরক্ষণের অর্থ হচ্ছে জীববৈচিত্র্যকে তাদের প্রাকৃতিক বসতির বাইরে রেখে সংরক্ষণ। সহজভাবে বলা যায় যে, কোনো বিলুপ্তপ্রায় জীব প্রজাতির প্রাকৃতিক জন্মস্থান বিপদগ্রস্থ হলে তাকে তার জন্মস্থান থেকে সরিয়ে অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে সংরক্ষণ করাকে অন্যস্থানে সংরক্ষণ বা এক্স-সিটু কনজারভেশন (*Ex-situ* conservation) বলে। যেমন- সুন্দরী গাছ সুন্দরবন থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেনে সংরক্ষণ করা হলে তখন ঐ পদ্ধতিটি হবে অন্যস্থানে সংরক্ষণ বা এক্স-সিটু কনজারভেশন।

এটি একটি ঝামেলাযুক্ত, কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল ব্যাপার। অনেক সময় নিজস্ব অবস্থানে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় এলাকা ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যেগ নেয়া সম্ভব হয় না। ফলে এদের অস্বিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নিজস্ব অবস্থানের বাইরে এক্স-সিটু পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সংরক্ষণ করা হয় বলে জীব প্রজাতি অনেক সময় নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারে না। বোটানিক্যাল গার্ডেন (botanical garden), সীড ব্যাংক (seed bank), জিন ব্যাংক (gene bank) স্থাপন ইত্যাদি অন্যস্থানে সংরক্ষণ বা এক্স-সিটু কনজারভেশনের উদাহরণ।

অন্যস্থানে সংরক্ষণ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ (Advantages of *Ex-situ* conservation) :

১। এ পদ্ধতিতে প্রতিকূল পরিবেশের বিপন্ন প্রজাতিগুলোকে দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপনা, সুরক্ষা ও প্রজনন করানো যায়।
২। অধিক সংখ্যোক জীব প্রজাতিকে সুনির্দিষ্ট স্থানে এনে সংরক্ষণ করা হয়।
৩। এটি মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি সংরক্ষণের সুবিধা প্রদাণ করে।
৪। গবেষণা, বর্ণনা ও মূল্যায়নের জন্য সহজে প্রবেশযোগ্য। এটি জীব প্রজাতিকে চরম বিপন্নের হাত হতে রক্ষা করে।

অন্যস্থানে সংরক্ষণ পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of *Ex-situ* conservation) :

১। এ পদ্ধতিতে জীব সংরক্ষণের জন্য অনেক আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হয় বলে এটি ব্যায়বহুল।
২। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সংরক্ষণ হয় বলে জীবের জেনেটিক বৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
৩। প্রজাতিগুলো ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক বন্যতা হারিয়ে ফেলে। এতে জীব প্রজাতির বিবর্তনগত অভিযোজন ক্ষমতা রহিত হয়।

অন্যস্থানে সংরক্ষণের কয়েকটি উদাহরণ (Some examples of *Ex-situ* conservation) :

১। উদ্ভিদ উদ্যান (Botanical garden) : পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ধরনের দুর্লভ প্রজাতি, অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি এবং ট্যাক্সোনোমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির উদ্ভিদকে সংগৃহীত করে প্রায় প্রাকৃতিক পরিবেশে যে বেষ্টিত স্থানে বিশুদ্ধ ও ফলিত চর্চার (pure and applied studies) উদ্দেশ্যে রোপণ, প্রতিপালন, প্রদর্শন করা হয় তাকেই উদ্ভিদ উদ্যান বা বোটানিক্যাল গার্ডেন বলে। যেমন- বলধা গার্ডেন (ঢাকাস্থ বলধা গার্ডেনকে- ফুল ও উদ্ভিদের জীবন্ত জাদুঘর' বলা হয়ে থাকে)। সারাবিশ্বে প্রায় ২০০০ উদ্ভিদ উদ্যান আছে। বিশ্বের মোট পুষ্পক উদ্ভিদ প্রজাতির চার ভাগের এক ভাগ প্রজাতির উদ্ভিদ লাগানো আছে উদ্ভিদ উদ্যানগুলোতে। কাজেই বিলুপ্তির হাত থেকে উদ্ভিদ প্রজাতিকে সংরক্ষণের একটি বড় উপায় হলো উদ্ভিদ উদ্যান।

২। বীজ ব্যাংক (Seed bank) : এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি। বীজকে শুকিয়ে -২০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফ্রিজিং করলে প্রায় অধিকাংশ প্রজাতির বীজকেই শতাব্দীর পর শতাব্দী সংরক্ষণ করা যায়। এ ধরনের বীজ মোট সবীজী উদ্ভিদের প্রায় ৭০% । কিন্তু অন্য ৩০% এর ক্ষেত্রে ভীজকে শুকালে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, এসব বীজকে রিক্যালসিট্রান্ট (recalcitrant) বীজ বলা হয়। রিক্যালসিট্রান্ট বীজের ক্ষেত্রে বীজ ব্যাংক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না। আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি রিক্যালসিট্রান্ট বীজের উদাহরণ। এ অবস্থায় মাঝে মাঝে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখা হয় এবং প্রয়োজনে বীজ থেকে গাছ সৃষ্টি করে পুনরায় বীজ সংগ্রহ করা হয়। তাই মাটিকে প্রাকৃতিক বীজ ব্যাংক বলা হয়।

৩। ফিল্ড জিন ব্যাংক (Field gene bank) : যেসব বীজে (৩০% সপুষ্পক) অধিক আর্দ্রতা বজায় না থাকলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় তাদের ক্ষেত্রে মাঠে উদ্ভিদ জীবন্ত অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়। শস্য প্রজাতির জন্য এ প্রক্রিয়া উত্তম। কাসাভার জন্য কলম্বিয়াতে ফিল্ড জিন ব্যাংক আছে। বাংলাদেশের হর্টিকালচার সেন্টারগুলোতে আম, লিচু ও নারিকেলের ফিল্ড জিন ব্যাংক রয়েছে।

৪। চিড়িয়াখানা (Zoo) : চিড়িয়াখানা এমন একটি স্থাপনা যেখানে জীবন্ত বন্য প্রাণিসমূহ খাচায় বন্দী করে রেখে সেখানে বিনোদন, গবেষণা ও প্রজননের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এটা জাতীয় পর্যায়ে বৃহৎ পরিসরে আবার ব্যাক্তি পর্যায়ে ক্ষুদ্র পরিসরে গড়ে উঠে। উদাহরণ- মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানা।

৫। নিম্নতাপমাত্রায় সংরক্ষণ (Low temperature conservation) : অঙ্গজ বংশবিস্তারে সক্ষম এমন অনেক উদ্ভিদের অঙ্গজ অংশ (যেমন- রাইজোম, বাল্ব, টিউবার, করম ইত্যাদি) সাধারণত অল্প জীবনকাল সম্পন্ন এবং দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়, যদি না এদরকে উপযুক্ত পরিবেশে সংরক্ষণ করা হয়। ৯০ ভাগ আপেক্ষিক আর্দ্রতা বা ৪°-৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গোল আলুকে ৫-৭ মাস হিমাগারে সংরক্ষণ করা যায়। আবার ১৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং উচ্চ আর্দ্রতায় মিষ্টি আলু কয়েক মাস সংরক্ষণ করা যায়। তবে এভাবে বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায় না।

৬। ইন-ভিট্রো সংরক্ষণ (*In-vitro* conservation) : এটি অন্যস্থানে সংরক্ষণের একটি প্রযুক্তিগত উপায়। এ উপায়ে গবেষণাগারে রিক্যালসিট্রান্ট প্রজাতির ক্যালাস (callus) টিসু সংরক্ষণ করা যায় বা তরল আবাদ মাধ্যমেও সংরক্ষণ করা যায়। অতি নিম্ন তাপমাত্রায় তরল নাইট্রোজেনে Cryogenic পদ্ধতিতে (-১৯৬° সেলসিয়াস) এদেরকে সংরক্ষণ করা যায়। তবে এতে সময়, খরচ ও অধিক সতর্কতার দরকার হয়।

৭। পরাগরেণু সংরক্ষণ (Pollengrain conservation) : নিম্ন তাপমাত্রা ও তরল নাইট্রোজেন প্রয়োগ করে পরাগরেণুকে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। পরাগরেণু সংরক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভিদের কেবল পুরুষ দিকটি সংরক্ষিত হয়, স্ত্রী দিকটি নয়। সংরক্ষিত পরাগরেণুকে ক্রসিং বা সংকরায়নে এবং হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ সৃষ্টিতে ব্যবহার করা যায়।

৮। ডিএনএ সংরক্ষণ (DNA conservation) : ডিএনএ সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ও কাঙ্খিত জিন সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষিত ডিএনএ বা জিনকে পরবর্তীতে জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে ট্রান্সজেনিক জীব তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। এ প্রক্রিয়াতে একটি বিশেষ জীবের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণ করা যায় মাত্র।

IUCN লাল তালিকা বিভাগ : IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) একটি বিশ্বভিত্তিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকারী সংস্থা যা বিলুপ্ত বা বিলুপ্তির অপেক্ষায় আছে এমন উদ্ভিদ ও প্রাণির তালিকা করেছে, যা IUCN Red List নামে পরিচিত। বিস্তর গবেষণা ও বিশেষজ্ঞদের আলাপ-আলোচনার পর IUCN এ সংক্রান্ত কতিপয় ক্যাটাগরি (শ্রেণি) নির্ধারণ করে দিয়েছে। IUCN এর বর্তমান নাম World Conservation union (WCU)

ক্যাটাগরিসমূহ নিম্নরূপ :

১। বিলুপ্ত প্রজাতি (Extinct species) : যে প্রজাতিটির সম্ভাব্য সব বাসস্থান এবং বছরের সব ঋতুতে পর্যায়ক্রমিক অনুসন্ধান চালানোর পর নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, প্রজাতিটির সর্বশেষ সদস্যটির মৃত্যু হয়েছে। এর আর কোনো সদস্য বেঁচে নেই। বাংলাদেশের এন্ডেমিক *Nothopegia acuminata* J. Sinclair এখন বিলুপ্ত।

২। বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত (Extinct in the wild) : যে প্রজাতিটি তার প্রাকৃতিক বন্য পরিবেশে আর পাওয়া যায় না বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে কিন্তু বাগানে চাষাবস্থায় বা কোথাও পালিত অবস্থায় (প্রাণির ক্ষেত্রে) এখনও সংরক্ষিতভাবে জীবিত সদস্য রয়েছে তাকে বলা হয় বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত। *Anthurim leuconeurum* এমন একটি প্রজাতি যা বন্য অবস্থায় বিলুপ্ত কিন্তু Kew garden-এ লাগানো আছে।

৩। অতিবিপন্ন (Critically endangered) : বিলুপ্তির কারণসমূহ অব্যাহত থাকলে যে প্রজাতিটি নিকট ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হওয়ার মতো চরম ঝুঁকিতে আছে তা হলো অতিবিপন্ন শ্রেণি।

৪। বিপন্ন প্রজাতি (Endangered species) : বিলুপ্তির কারণসমূহ অব্যাহত থাকলে যে প্রজাতিটি ভবিষ্যতে অতিবিপন্ন অবস্থায় পরিণত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে, সেটি হলো বিপন্ন প্রজাতি।

৫। বিপদগ্রস্থ/শঙ্কাগ্রস্থ (Vulnerable species) : বিলুপ্তির কারণসমূহ অব্যাহত থাকলে যে প্রজাতিটি ভবিষ্যতে বিপন্ন শ্রেণিভুক্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে, তা হলো বিপদগ্রস্থ বা শঙ্কাগ্রস্থ শ্রেণি।

৬। বিরল প্রজাতি (Rare species) : এসব প্রজাতির পপুলেশন সংখ্যা খুব কম এবং বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তৃত বা বিশেষ কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলে সীমিত থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে অতিবিপন্ন, বিপন্ন, বিপদগ্রস্থ শ্রেণি তিনটিকে একত্রে হুমকিগ্রস্থ (threatened) প্রজাতি বলে।

Abroma augusta Linn.

Celosia argentea Linn.

Withania somnifera Dunal.

Ampelopsis glandulosa

Basella alba Linn.

Hyptis suaveolens (Linn) Poit.

Nothopegia acuminata

Anthurim leuconeurum

Andrographis paniculata

Aquilaria sinensis

ইন-সিটু কনজারভেশন ও এক্স-সিটু কনজারভেশনের মধ্যে পার্থক্য (Differences between *In-situ* conservation and *Ex-situ* conservation) :

ক্রম	ইন-সিটু কনজারভেশন (*In-situ* conservation)	এক্স-সিটু কনজারভেশন (*Ex-situ* conservation)
১।	স্বাভাবিক বাসস্থানের পরিবেশের মধ্যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে ইন-সিটু কনজারভেশন বলে।	স্বাভাবিক বাসস্থানের পরিবেশের বাইরে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে এক্স-সিটু কনজারভেশন বলে।
২।	এতে কেবল জীবন্ত উদ্ভিদ ও প্রাণি সংরক্ষণ করা যায়।	এতে জীবন্ত উদ্ভিদ ও প্রাণি ছাড়াও তাদের বীজ, পরাগরেণু, শুক্রাণু, ডিম্বাণু, ভ্রূণ, ভাজক কলা, ডিএনএ ইত্যাদি সংরক্ষণ করা যায়।
৩।	এ পদ্ধতিতে অর্থ ও সময় কম ব্যয় হয়।	অধিকাংশক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে অর্থ ও সময় বেশি ব্যয় হয়।
৪।	স্বস্থানে সংরক্ষণের কারণে জীবটির সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য জীবেরাও সংরক্ষিত হয়।	অন্যস্থানে সংরক্ষণের কারণে জীবটির সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য অনেক জীব বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে।
৫।	এ ধরনের সংরক্ষণে বিবর্তন প্রক্রিয়া চালু থাকে।	এ ধরনের সংরক্ষণে বিবর্তন প্রক্রিয়া চালু থাকে না।
৬।	এ পদ্ধতিতে সংরক্ষণের জন্য বৃহৎ এলাকা দরকার হয়।	এ পদ্ধতিতে অল্প জায়গায় অধিক প্রজাতি সংরক্ষণ করা যায়।
৭।	উদাহরণ- জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য ইত্যাদি।	উদাহরণ- চিড়িয়াখানা, বীজ ব্যাংক ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকার পিরামিডের মধ্যে পার্থক্য (Differences between different types of pyramids) :

বৈশিষ্ট্য (Features)	সংখ্যার পিরামিড (Number Pyramid)	জীবভর পিরামিড (Biomass Pyramid)	শক্তির পিরামিড (Energy Pyramid)
১। প্রকৃতি	প্রতিটি খাদ্যস্তরে কত সংখ্যেক জীব থাকে তা এ পিরামিডে প্রদর্শিত হয়।	প্রতিটি খাদ্যস্তরে কি পরিমাণ জীবভর থাকে তা এ পিরামিডে প্রদর্শিত হয়।	প্রতিটি খাদ্যস্তরে কি পরিমাণ জৈবিক শক্তি থাকে তা এ পিরামিডে প্রদর্শিত হয়।
২। তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	প্রতি স্তরের জীব সংখ্যা গণনা করা হয়।	প্রতি স্তরের জীব সংখ্যা ওজন করা হয়।	প্রতি স্তরের জীব শুকিয়ে পোড়ানো হয় এবং ক্যালোরিমিটার দিয়ে তাপ নির্ণয় করা হয়।
৩। প্রকার	উর্ধ্বমুখী বা আংশিক উর্ধ্বমুখী বা উল্টানো।	উর্ধ্বমুখী বা উল্টানো ধরনের হয়ে থাকে।	সর্বদা উর্ধ্বমুখী।
৪। সুবিধা	সহজেই গণনা করা যায়, কোনো জীবকে মারতে হয় না।	শীর্ষের দিকে ক্রমে আকার সরু থাকে।	রূপান্তরে দক্ষতা প্রদর্শন করে।
৫। অসুবিধা	জীবের আকার অগ্রাহ্য করে।	সকল জীবকে ধরা বা ওজন করা কঠিন।	সকল জীব থেকে তাপশক্তি বের করা কঠিন।
৬। ব্যবহৃত একক	জীবের সাধারণ সংখ্যা।	গ্রাম, কিলোগ্রাম, টন/বর্গমিটার, কিলোমিটার/বছর।	কিলোক্যালরি/বর্গমিটার/বছর।

জলজ, মরুজ ও লোনা মাটির উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য
(Differences between hydrophytes, mesophytes and helophytes) :

বৈশিষ্ট্য (Features)	জলজ উদ্ভিদ (Hydrophytes)	মরুজ উদ্ভিদ (Mesophytes)	লোনা মাটির উদ্ভিদ (Helophytes)
১। মূল	মূল সুগঠিত নয়।	মূল সুগঠিতি এবং মাটির নিচে বহুদুর পর্যন্ত বিস্তৃত।	মূল সুগঠিত।
২। কাণ্ড	কাণ্ড নরম হয়।	কাণ্ড শক্ত হয়।	কাণ্ড শক্ত বা নরম হতে পারে।
৩। পাতার আকার	পাতা বড় ও নরম হয়।	পাতা ক্ষুদ্র হয়।	পাতা ক্ষুদ্র ও স্ফীত হতে হরে।
৪। কিউটিকল	নিমজ্জিত পাতায় কিউটিকল থাকে না।	কাণ্ড ও পাতার ত্বকে কিউটিকলের মোটা স্তর থাকে।	কাণ্ড ও পাতার উপরিভাগে পুরু কিউটিন স্তর থাকে।
৫। পত্ররন্ধ্র	নিমজ্জিত অংশে পত্ররন্ধ্র নেই।	পাতার নিম্নপৃষ্টে ও কান্ডে পত্ররন্ধ্র থাকে।	পত্ররন্ধ্র ক্ষুদ্র ও কমসংখ্যেক।
৬। পরিবহন কলা	পরিবহন কলাগুচ্ছ ক্ষীণ ও দুর্বল।	পরিবহন কলাগুচ্ছ সুগঠিত।	পরিবহন কলাগুচ্ছ সুগঠিত।
৭। আধিক্য	পাতায় স্পঞ্জিপ্যারেনকাইমা কোষের আধিক্য।	পাতায় প্যালিসেডপ্যারেনকাইমা কোষের আধিক্য।	পাতার মেসোফিল টিস্যুতে প্যালিসেডের আধিক্য।
৮। পাতার আকার	পাতা বড় ও নরম হয়।	পাতা ক্ষুদ্র হয়।	পাতা ক্ষুদ্র ও স্ফীত হতে পারে।
৯। প্রস্বেদন	পানিতে জীবনধারনের ফলে প্রস্বদনের প্রয়োজনীয়তা খুব কম।	ত্বকে স্থুল কিউটিন, বহুস্তরযুক্ত এপিডার্মিস, নিমজ্জিত পত্ররন্ধ্র ইত্যাদি প্রস্বেদন হার কমায়।	স্ফীত ও মাংশল উদ্ভিদের প্রস্বেদন হার খুব কম।
১০. জনন	রাইজোম দ্বারা অঙ্গজ জনন সম্পন্ন হয়। বীজ দ্বারা বংশবৃদ্ধি কম। বীজের অঙ্কুরোদগম প্রধানত মৃদগত।	কতকক্ষেত্রে অঙ্গজ জনন সম্পন্ন হয। বেশিরভাগ বীজ দ্বারা বংশবৃদ্ধি করে। বীজের অঙ্কুরোদগম প্রধানত মৃদগত বা মৃৎভেদী।	স্ফীত ও মাংশল উদ্ভিদে অঙ্গজ জনন হয়। বেশিরভাগ উদ্ভিদের বীজ দ্বারা বংশবৃদ্ধি হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম প্রধানত জরায়ুজ।

বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য (Wildlife Sanctuary) : বাংলাদেশের বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ আইন ১৯৭৪ অনুযায়ী অভয়ারণ্য হলো এক ধরনের সংরক্ষিত বনভূমি (reserve forest) যেখানে সব ধরনের শিকার, পশু-পাখি মারা বা ধরা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বনের বন্যতা রক্ষা করাই অভয়ারণ্য স্থাপনের মূর উদ্দেশ্য। উদ্ভিদ ও প্রাণির নিরাপদ বংশবৃদ্ধির জন্য এসব এলাকাকে উপদ্রবহীন এলাকা বলে চিহ্নিত করা হয়। এর স্বাভাবিক পরিবেশকে ব্যাহত বা ক্ষুন্ন করার কারো অনুমতি নেই। এমনকি এসব এলাকায় জনসাধারণের প্রবেশও নিষিদ্ধ। UNESCO ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনস্থ তিনটি বন্যপ্রাণি অবয়ারণ্যকে ৭৯৮ নম্বর **'বিশ্ব ঐতিহ্য'** বা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ (world heritage) তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে এবং ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সরকার সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য অঞ্চল বা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষনা করে।

অভয়ারণ্য স্থাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of Sanctuary Establishment) :

১। উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলকে প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষণ করা। ২। বন্যপ্রাণির জন্য সুষ্ট প্রজনন ভূমি সৃষ্টি করা। ৩। জীববৈচিত্র্যভিত্তিক গবেষণাক্ষেত্র তৈরি করা। ৪। জনসাধারণের বিনোদন ও বন্যপ্রাণি পর্যবেক্ষনের সুযোগ সৃষ্টি করা। ৫। বিলুপ্তপ্রায় প্রাণির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে প্রজননসহ অন্যান্য বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদাণ। ৬। স্থানীয় পাখির মুক্ত চলাচল এবং যাযাবর পাখির মুক্ত বিচরণ নিশ্চিতকরণ। ৭। ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য রক্ষা করা।

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ আইন (১৯১২) অনুযায়ী ১৭টি সংরক্ষণ এলাকা প্রতিষ্টা করা হয়। নিম্নে সংরক্ষণ এলাকার বন্যপ্রাণি অবয়ারণ্যসমুহের নাম, অবস্থান, আয়তন, জেলার নাম ও প্রতিষ্টাকাল দেয়া হলো-

সংরক্ষিত এলাকার নাম	অবস্থান (জেলা)	আয়তন (হেক্টরে)	প্রতিষ্ঠাকাল
১। সুন্দবন বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য (পূর্ব)	বাগেরহাট	৩১২২৬	১৯৯৬
২। সুন্দবন বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য (পশ্চিম) (সবচেয়ে বড়)	সাতক্ষীরা	৭১৫০২	১৯৯৬
৩। সুন্দবন বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য (দক্ষিণ)	খুলনা	৩৬৯৭০	১৯৯৬
৪। পাবলাখালী বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য	রাঙ্গামাটি	৪২০৮৭	১৯৮৩
৫। চর কুকড়ি-মুকড়ি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য (সবচেয়ে ছোট)	ভোলা	৪০	১৯৮১
৬। রেমা কালেঙ্গাবন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য	হবিগঞ্জ	১৭৯৫	১৯৯৬
৭। হাজারিখিল বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	১১৭৭	২০১০
৮। চুনতি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	৭৭৬৪	১৯৮৬
৯। ফাuসিয়াখালী বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য	কক্সবাজার	১৩০২	২০০৭
১০। দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম	৪৭১৬	২০১০
১১। টেকনাফ বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য	কক্সবাজার	১১৬১৫	২০১০
১২। সাঙ্গু বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য	বান্দরবন	২৩৩১	২০১০
১৩। টেংরাগিরি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য	বরগুনা	৪০৪৮	২০১০
১৪। দুধমুখী বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	১৭০	২০১২
১৫। ঢাংমারি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য	বাগেরহাট	৩৪০	২০১২
১৬। সোনারচর বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য	পটুয়াখালি	২০২৬	২০১১
১৭। নাজিরগঞ্জ (ডলফিন) বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য	পাবনা	১৪৬	২০১৩

চর কুকড়ি-মুকড়ি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য (সবচেয়ে ছোট)

সুন্দবন বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য (পশ্চিম) (সবচেয়ে বড়)

সাঙ্গু বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য

মৎস্য অভয়াশ্রম (Fisheries Sanctuary) : হারিয়ে যাওয়া মৎস্যসম্পদ ও জলজ জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধারের জন্য যখন বিশেষ ব্যবস্থাপনায় মাছের আবাসস্থলকে সংরক্ষণ করা হয় তখন তাকে মৎস্য অভয়াশ্রম বলা হয়। বাংলাদেশে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী, স্রোতস্বিনী, মিঠাপানির হ্রদ, হাওড়, বাওড়, খাল, বিল, পুকুর, ডোবা, প্লাবন ভূমি এবং বিস্তৃত মোহনার জলাভূমির এক বিশাল ভান্ডার। এসব জলাভূমিতে রয়েছে ৫০০০ এর অধিক সপুষ্পক উদ্ভিদ, ৭৫০ প্রজাতির পাখি ও ৫০০ প্রজাতির মাছ। কেবল মিঠাপানির জলাভূমিতেই রয়েছে প্রায় ২৫০ প্রজাতির মাছ। কিন্তু এক সময় এসব জলাভূমিতে আরো অনেক বেশি মাছের প্রজাতি ছিলো। মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ডে আজ এসব জলাভূমি এবং এদের মৎস্য সম্পদ আজ হুমকির সম্মুখীন। বেশ কয়েক প্রজাতির মাছ ইতোমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং অনেকগুলো বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে।

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives of fisheries sanctuary) :

১। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মাছের নিরাপদ আবাসস্থল নিশ্চিত করা।

২। মাছের অবাধ প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র সংরক্ষণ করা।

৩। নিরাপদ আশ্রয় সৃষ্টির মাধ্যমে বিলুপ্তপ্রায় বা বিপন্ন প্রজাতির মাছের সংরক্ষণ করা।

৪। মাছের প্রজাতিগত ও বংশগতিগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা।

৫। প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদের বৃদ্ধি ও মজুত ঘটান।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং জলাশয় ভেদে মৎস্য অভয়াশ্রম নিম্নোক্ত ধরনের হতে পারে-

১। মৌসুমি অভয়াশ্রম (Seasonal sanctuary) : নির্দিষ্ট প্রজাতির মাছ বছরে নির্দিষ্ট সময়ে উপযুক্ত বা নির্দিষ্ট প্রজনন ক্ষেত্রে বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে নির্দিষ্ট আবাসে বিচরণ করে থাকে। তাই অবাধ প্রজনন ও বিচরণের জন্য সুনির্দিষ্ট জলাশয় বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মাছের অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষনা করা হয়। যেমন- হালদা নদীর মদুনা ঘাট এলাকা, কাপ্তাই লেকের লং যাদু ও বিলাইছড়ি এলাকা। সরকার ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের জন্য দেশে ইলিশের জন্য ৪টি অভয়াশ্রম ঘোষনা করেছে- ক. মেঘনা নদীর ঘাট নল থেকে চর আলেকজান্ডার পর্যন্ত প্রায় ১০০ কিলোমিটার। খ. বোলার ভেদুরিয়া থেকে পটুয়াখালির চর রুস্তম পর্যন্ত (তেতুলিয়া নদী) প্রায় ১০০ কিলোমিটার। গ. ভোলার মনদপুর / চর ইলশা থেকে চরপিয়াল পর্যন্ত প্রায় ৯০ কিলোমিটার এবং ঘ. পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদী প্রায় ৪০ কিলোমিটার। এসমস্ত অভয়াশ্রম ৪টির প্রথম ৩টিতে প্রতি বছর মার্চ থেকে এপ্রিল, চতুর্থটিতে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত ইলিশ মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে।

২। সাংবাৎসরিক অভয়াশ্রম (Annual Sanctuary) : কোনো জলাশয়ে নির্দিষ্ট এলাকায় সারা বছরের জন্য মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হলে তাকে সাংবাৎসরিক মৎস্য অভয়াশ্রম বলে। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে অনেক হাওড়ের কোনো কোনো অংশ সাংবাৎসরিক অভয়াশ্রম। এগুলোতে ২/৩ বছর পর পর মাছ ধরা হয়।

৩। স্থায়ী অভয়াশ্রম (Permanent Sanctuary) : যখন কোনো অঞ্চলে কোনো নদী বা বিলের সম্পূর্ণ বা নির্দিষ্ট অংশ দীর্ঘ মেয়াদে স্থায়অভাবে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়। সরকারি নীতিমালার আলোকে মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন ধরনের জলাশয়ে ২০০৫-২০০৬ পর্যন্ত ৩৭৭টি এবং গত কয়েক বছরে ২০০৮-২০০৯ পর্যন্ত বাংলাদেশে মৌসুমি ও সাংবাৎসরিক মৎস্য অভয়াশ্রমের সংখ্যা বেড়ে ৫৬৬টিতে উন্নিত হয়েছে। এগুলো ছাড়াও সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটাপন্ন মৎস্য আবাসন এলাকায় বড় আকারে মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ এবং জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য রামসার কনভেনশন অনুযায়ী বেশ কয়েকটি জলাভূমিকে ১৯৯৯ সালে মৎস্য অভয়ারণ্য ও পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ecologically critical areas) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এরকম কয়েকটি জলাভূমি হলো-

টাঙ্গুয়ার হাওড় (Tanguar haor) : বাংলাদেশের একটি প্রখ্যাত ওয়েটল্যান্ড হলো টাঙ্গুয়ার হাওড়। এটি সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা ও তাহেরপুর উপজেলায় অবস্থিত এবং ৫১টি জলমহল নিয়ে প্রায় ১০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। স্থানীয়ভাবে এটি ***'ছয় কুড়ি বিল নয় কুড়ি কান্দা'*** নামে পরিচিত। এ হাওড়ের মোট আয়তন ৬৯১২ একর। তবে বর্ষাকালে এর আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ২০,০০০ একর। ১৯৯৯ সালে একে পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ecologically critical areas) হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ মিঠাপানির এ হাওড়কে ২০০০ সালে রামসার সাইট (ramsar site) হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে। মেঘালয়ের খাসিয়া ও জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এ হাওড়ে রয়েছে প্রাণি ও উদ্ভিদের বিশাল সমহার। এ হাওড় লালন করছে প্রাকৃতিক জলমগ্ন (natural swamp forest) বনভূমির শেষ নিদর্শনটুকু। এখানে ২০৮ প্রজাতির পাখি, ১৫০ প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ, ১৫০ প্রজাতির মাছ, ৩৪ প্রজাতির সরীসৃপ ও ১১ প্রজাতির ব্যাঙ রয়েছে। স্থানীয় পাখি ছাড়াও শীতকালে সুদূর সাইবেরিয়া থেকে আগত পরিযায়ী পাখির আবাস এ হাওড়। এখানকার উদ্ভিদের মধ্যে হলো হিজল, করচ, বরুন, পানিফল, হেলেঞ্চা, বনতুলসি, নলখাগড়া ইত্যাদি প্রধান।

টাঙ্গুয়ার হাওড় মাছের এক বিশাল ভান্ডার এবং আমাদের দেশের মিঠাপানির মাছের বংশবৃদ্ধির উপযুক্ত স্থান। এগুলোর মধ্যে ১০টি প্রজাতি ২০০৩ সালে IUCN-এর লাল ডাটা বুকে (Red Data Book) তালিকাভূক্ত হয়েছে বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে। এখানে *Tor tor* ও *Tor putitora* নামের দুটি বিরল প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। টাঙ্গুয়ার হাওড়কে বলা হয় বিনামূল্যের সম্পদ ভান্ডার। আজ এই ভান্ডারের বিশাল জীববৈচিত্র্য নানা ধরনের অব্যবস্থাপনার কারণে বিপন্ন অবস্থায় পতিত হয়েছে।

হাকালুকি হাওড় (Hakaluki haor) : এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ হাওড় এবং এশিয়ার এক বৃহত্তম মিঠা পানির জলাভূমি, যার আয়তন ১৮১.১৫ বর্গ কিলোমিটার। এটি সিলেট ও মৌলভীবাজারের ৫টি উপজেলা নিয়ে বিস্তৃত। এতে বড়, মাঝারি, ছোট মিলে প্রায় ২৪০টি বিল ও ছোট বড় ১০টি নদী আছে। এছাড়া এতে জলাবন রয়েছে যার অনেকটা বর্ষাকালে ডুবে যায়। ফলে এটি মাছ ও জলজ প্রাণির অভয়াশ্রমে পরিণত হয়। ১৯৫৯ সালে একে ইকোলজিক্যাল ক্রিটিক্যাল এরিয়া এবং ২০১২ সালে রামসার সাইট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

ভৌগোলিক অবস্থান ও আবাসের জন্য এ হাওড়ে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বাস্তুতন্ত্র। বৈচিত্র্যময় জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রের জন্য এ হাওড়টি অতি পরিচিত। এখানে প্রায় ৭৩ প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ, ১০৭ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ, ২৩ প্রজাতির সরিসৃপ, ৫ প্রজাতির উভচর এবং ২৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণির আবাস। মানুষের প্রতিবন্ধকতার কারণে এ হাওড়ের অবস্থা ক্রমশবিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এর বাস্তুতন্ত্রে প্রতিনিয়ত আঘাত হানার কারণে এখানকার জীববৈচিত্র্য এক কঠিন হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।

এ হাওড়ের ১০৭ প্রজাতির মাছের মধ্যে ১৬ প্রজাতির মাছ ইতোমধ্যে ঘোষিত হয়েছে বিপন্ন (endangered) প্রজাতি হিসেবে, ১২ প্রজাতির মাছ বর্তমানে যথেষ্ট সংখ্যায় থাকলেও অদুর ভবিষ্যতে এগুলো শংকাকুল (vulnerable) হতে পারে, অন্যদিকে ৪ প্রজাতির মাছ ঘোষিত হয়েছে অতিবিপন্ন (critically endangered)। ২০০৮ সালে IUCN-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, বর্তমানে মাত্র ৭৫ প্রজাতির অস্তিত্ব এই হাওড়ে আছে। নদী ও সাগরের বাইরে একমাত্র এ হাওড়ে ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। যদিও এ ইলিশ খুব ছোট (১০০-২৫০ গ্রাম) হয়ে থাকে। তবে হাওড়ে প্রাপ্ত ইলিশ মাছে নদীতে পাওয়া ইলিশ মাছের মতো স্বাদ বা ঘ্রাণ নেই।

দেশি পাখির বিচরণ ছাড়াও প্রতি বছর শীতকালে প্রায় ১৫০ প্রজাতির অতিথি পাখি সাইবেরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে এখানে আসে। এ কারণে বাংলাদেশ সরকার হাকালুকি হাওড়কে ১৯৯৯ সালে ecologically critical area হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং পরিবেশ আইন ১৯৯৫ অনুযায়ী এ হাওড়ে পরিবেশের প্রতি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এমন কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়েছে।। বর্তমানে দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা এর জীববৈচিত্র্য রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

হালদা নদী (Halda river) : হালদা হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র দেশি নদী। প্রায় ৯৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এ নদী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় উপজেলার পাতাছোড়া ইউনিয়নের হালদাছড়া থেকে সৃষ্ট হয়ে ফটিকছড়ির রাউজান, হাটহাজারীর কালুরঘাট অতিক্রম করে চট্টগ্রামের উপকণ্ঠে কর্ণফুলী নদীতে মিশে গেছে। এর পানির উৎস মানিকছড়ির পাহাড়ে অবস্থিতবেশ কয়েকটি ছড়া (rivulets)। নদীটির গভীরতা ২৫ থেকে ৫০ ফুট। এটি শুধু বাংলাদেশের নয়, পৃথিবীরও একমাত্র জোয়ার-ভাটার নদী যা অন্যতম বৃহৎ রুই জাতীয় মাছের (রুই, কাতল, মৃগেল) প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র এবং দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র যেখান থেকে সরাসরি রুই জাতীয় মাছের নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করা হয়। কিছু মা মাছ স্থায়ীভাবে হালদায় বাস করে, বাকিগুলো মূলত কর্ণফুলী থেকে হালদায় আসে।

বাংলাদেশের অন্যান্য নদী থেকে হালদা নদীর বিশেষ পার্থক্য প্রধানত পরিবেশগত। বর্ষা মৌসুমে নদীর কিছু পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের জন্য এখানে মাছ ডিম ছাড়তে আসে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো ভৌতিক, রাসায়নিক এবং জৈবনিক। অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় বজ্রসহ প্রচুর বৃষ্টিপাত, উজানের পাহাড়ি ঢল, তীব্র স্রোত, ফেনিল ঘোলা পানিসহ নদীর ভৌত-রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বিত ক্রিয়ায় হালদা নদীতে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাতে রুই জাতীয় মাছ বর্ষাকালে ডিম ছাড়তে উদ্বুদ্ধ হয়। এ পরিবেশ বাংলাদেশের অন্যান্য নদ-নদী থেকে স্বতন্ত্র। তাই হালদা নদী বাংলাদেশের প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ঐতিহ্য। হালদা কেবল প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ঐতিহ্য নয়, এটি ইউনোস্কোর শর্ত অনুযায়ী বিশ্ব প্রাকৃতিক ঐতিহ্যেরও যোগ্যতা রাখে।

হালদার বর্তমান প্রধান সমস্যগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১। লবণ্যক্ততা বেড়ে যাওয়া।

২। শিল্পকারখানার বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য, ইটভাটার দূষণ এবং রাসায়নিক সার ও কীটনাশক জনিত দূষণ।

৩। অবাধে মা মাছ শিকার। প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র রক্ষার পূর্ব শর্ত হচ্ছে মা মাছ সংরক্ষণ।

৪। প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংসের আরেকটি কারণ হচ্ছে হালদার ৩৬টি শাখা খাল, নদী ও ছড়াগুলোতে অপরিকল্পিতভাবে সুইস গেট, বাধ এবং রাবার ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা।

৫। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন এবং হারদার বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

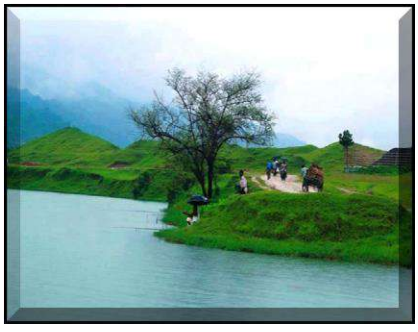

টাঙ্গুয়ার হাওড়

হাকালুকি হাওড়

হালদা নদী

চিত্র : বাংলাদেশের বিভিন্ন মৎস্য অভয়াশ্রম

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান (National Botanical Garden) : প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসহ যেসব স্থানে সব ধরনের গাছপালা ও বন্য-জীবজন্তু নিজস্ব পরিবেশে কেন্দ্রীয় সরকারে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত হয় তাদের জাতীয় উদ্যান বা ন্যাশনাল পার্ক বলে। তবে জীববিজ্ঞানের ভাষায় উদ্ভিদ উদ্যান বরতে এমন একটি স্থানকে বুঝায় যেখানে শিক্ষা, বিনোদন, অর্থনৈতিক এবং গবেষণার উদ্দেশ্যে উদ্ভিদ জন্মানো ও সংরক্ষণ করা হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নয়নের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন উদ্ভিদ উদ্যানগুলো বৈচিত্র্য সম্পন্ন উদ্ভিদ প্রজাতিগুলোকে সংরক্ষণ করছে যেগুলো শ্রেণিবিন্যাসবিদদের নিকট অধিক গুরুত্ব বহন করে।

বাংলাদেশের প্রাচীনতম উদ্ভিদ উদ্যান হলো জামালপুর শহরে অবস্থিত 'চৈতন্য নার্সারি' যা ১৮৯৪ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ উদ্যানে একসময় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক কৃষিজ, ফলজ ও শোবাবর্ধনকারী উদ্ভিদ ছিলো। এর কয়েক বছর পরে ১৯০৯ সালে জমিদার নরেন্দ্র নারায়ন রায় ঢাকার ওয়ারিতে 'বলধা গার্ডেন' নামে একটি উদ্ভিদ উদ্যান প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকার মিরপুরে প্রায় ৮৪ হেক্টর জমির উপর। দেশি, বিদেশি এবং প্রচুর জলজ উদ্ভিদসহ এখানে প্রায় ৫০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে।

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের বৈশিষ্ট্য বা শর্ত (National botanical garden features or conditions) :

১। জাতীয় উদ্যান পরিসরে বেশ বড় হয় (প্রায় ০.০৪ থেকে ৩১৬২ কিলোমিটার)। ২। জাতীয় উদ্যানে শিকার সম্পূর্ণ নিষেধ। ৩। এটি সরকারের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ৪। জাতীয় উদ্যানে পর্যটকদের প্রবেশের সুব্যবস্থা রয়েছে। ৫। জাতীয় উদ্যানে বেশিরভাগ অংশের সংরক্ষণের এমন ব্যবস্থা থাকে যাতে কোনো রকম পরিবেশগত পরিবর্তন না আসে।

জাতীয় উদ্যান সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (Aims and objectives of national park creation) :

১। কার্যকর ইকোসিস্টেম ও উদ্যানের অভ্যন্তরীণ সম্পদসমূহকে রক্ষা করা। ২। ভবিষ্যতের জন্য ক্ষেত্র তৈরি করতে সহায়তা করা। ৩। সর্বাধিক সংখ্যেক প্রজাতি রক্ষার উদ্দেশ্যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হয়। ৪। যেসব প্রজাতি ধ্বংসের সম্মুখীন তাদের সংরক্ষণের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদাণ করা। ৫। উদ্যানের অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সহায়তা করা। ৬। শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা। ৭, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করা। ৮। পর্যটনের এবং চিত্তবিনোদনের স্থান হিসেবে সংরক্ষণ করা।

বাংলাদেশে ১৭টি জাতীয় উদ্যান রয়েছে। নিচে এই উদ্যানসমুহের নাম, অবস্থান, আয়তন এবং প্রতিষ্ঠাকাল উল্লেখ করা হলো-

সংরক্ষিত জাতীয় উদ্যান	অবস্থান (জেলা)	আয়তন (হেক্টরে)	প্রতিষ্ঠাকাল
১। মধুপুর জাতীয় উদ্যান	ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল	৮৪০৩	১৯৬২
২। ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান	গাজীপুর	৫০২২	১৯৮২
৩। রামসাগর জাতীয় উদ্যান (সবচেয়ে ছোট)	দিনাজপুর	৫২	২০০১
৪। হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান (সর্বপ্রথম)	কক্সবাজার	১৭২৯	১৯৮০
৫। লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান	মৌলভীবাজার	১২৫০	১৯৯৬
৬। সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান	হবিগঞ্জ	২৪৩	২০০৪
৭। কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান	পার্বত্য চট্টগ্রাম	৫৪৬৪	১৯৯৯
৮। নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান (সবচেয়ে বড়)	নোয়াখালী	১৬৩৫২	২০০১
৯। মেধা কচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান	কক্সবাজার	৩৯৬	২০০৪
১০। আলতাদীঘী জাতীয় উদ্যান	নওগাঁ	২৬৪.১২	২০১১
১১। বাড়িয়াঢালা জাতীয় উদ্যান	চট্টগ্রাম	২৯৩৩.৬১	২০১০
১২। বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	১৬৮.৫৬	২০১১
১৩। কাদিগড় জাতীয় উদ্যান	ময়মনসিংহ	৩৪৪.১৩	২০১০
১৪। খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান	সিলেট	৬৭৮.৮	২০০৬
১৫। কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান	পটুয়াখালী	১৬১৩	২০১০
১৬। নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	৫১৭.৬১	২০১০
১৭। সিংড়া জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	৩০৫.৬৯	২০১০

❖ **ইকোলজি (Ecology) :** জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবের সাথে তার পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে ইকোলজি বা বাস্তুবিদ্যা বা পরিবেশবিজ্ঞান বলে।

❖ **ইকোসিস্টেম (Ecosystem) :** কোনো স্থানের জীব (উদ্ভিদ, প্রাণি, অণুজীব ইত্যাদি) ও এদের পরিবেশ এবং পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার গতিময় পদ্ধতিকে ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র বলে।

❖ **নিশ (Nish) :** কোনো নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে কোনো জীবের নির্দিষ্ট সম্পর্ক বা ভূমিকাকে নিশ বলে।

❖ **প্রজাতি (Species) :** প্রজাতি হলো শ্রেণিবিন্যাসের মৌলিক একক। প্রজাতি বলতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সর্বাধিক মিলসম্পন্ন একদল জীবকে বোঝায়, যারা নিজেদের মধ্যে যৌন মিলনে উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম।

❖ **জীবগোষ্ঠী বা পপুলেশন (Population) :** একটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে বসবাসকারী একই প্রজাতির একদল জীবকে জীবগোষ্ঠী বা পপুলেশন বলে।

❖ **জীবসম্প্রদায় বা কমিউনিটি (Biological communities) :** যখন প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রজাতির একদল জীব (উদ্ভিদ, প্রাণি, অণুজীব) পরস্পরের সাথে সুবিধাজনক সমন্বয় ও আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে সহাবস্থান করে তখন তাদেরকে জীবসম্প্রদায় বা কমিউনিটি বলে।

❖ **উৎপাদক (Producer) :** যে সকল সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে তাদেরকে উৎপাদক বলে। বিভিন্ন সবুজ উদ্ভিদ বিভিন্ন ইকোসিস্টেমে উৎপাদক হিসেবে অবস্থান করে।

❖ **খাদক (Consumer) :** যে সকল প্রাণি তাদের খাদ্য চাহিদা মিটানোর জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণির উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণিদের খেয়ে জীবনধারণ করে তাদেরকে খাদক বলে।

❖ **ইকোলজিক্যাল পিরামিড (Ecological pyramid) :** বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে খাদ্যশৃঙ্খলের বিন্যাস নকশা আকারে উপস্থাপন করলে যে পিরামিড আকৃতির নকশা সৃষ্টি হয় তাকে ইকোলজিক্যাল পিরামিড বলে।

❖ **শক্তির পিরামিড (Pyramid of energy) :** ইকোসিস্টেমের একটি খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন খাদ্যস্তরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহৃত হয় তার দ্বারা রৈখিক চিত্র অঙ্কন করলে দেখা যাবে যে, এটি একটি পিরামিডের আকৃতি ধারন করেছে, একে শক্তির পিরামিড বলে।

❖ **বায়োম (Biome) :** একই ধরনের জলবায়ু, একই ধরনের ভূমি এবং একই জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্নউদ্ভিদ ও প্রাণি নিয়ে গঠিত পৃথকযোগ্য ও বৃহৎ ইকোসিস্টেমকে বায়োম বলে।

❖ **বায়োমাস (Biomass) :** কোনো ইকোসিস্টেমে অবস্থানরত কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যেকোনো পুষ্টিস্তরের সকল জীবের সামগ্রিক ওজনকে ঐ স্তরের বায়োমাস বা জীবভর বলে।

❖ **জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) :** পৃথিবীর মাটি, পানি ও বায়ুতে বসবাসকারী সকল উদ্ভিদ, প্রাণি ও অণুজীবের মধ্যে যে জিনগত, প্রজাতিগত ও বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্যতা দেখা যায় তাকেই জীববৈচিত্র্য বা বায়োডাইভারসিটি বলে।

❖ **প্রাণিভূগোল (Animal geography) :** প্রাণিবিজ্ঞানের যে মাখায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাণিদের অবস্থান, ভৌগোলিক বিস্তার ও বিস্তারের নিয়ামক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে প্রাণিভূগোল বলে।

❖ **প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল (Zoological region) :** মেরুদন্ডী প্রাণিদের বিস্তারের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। এই অঞ্চলগুলিকে প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল বলে।

❖ **এন্ডোমিক প্রাণি (Endomic animals) :** যেসব প্রাণি কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বাস করে এবং অন্য কোনো অঞ্চলে পাওয়া যায় না, তাদেরকে ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলেরে এন্ডোমিক প্রাণি বলা হয়।

❖ **এক্সোটিক (Exotic) :** এক ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে অন্য ভৌগোলিক অঞ্চলে প্রবর্তনকারীউদ্ভিদ বা প্রাণিকে আগত অঞ্চলের এক্সোটিক এক্সোটিক উদ্ভিদ বা প্রাণি বলে।

❖ **ওয়ালেস লাইন (Wallace Line) :** ওরিয়েন্টাল ও অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের মাঝখানে ব্রিটিশ প্রকৃতিবিদ ওয়ালেস প্রদত্ত কাল্পনিক সীমারেখাকে ওয়ালেস লাইন বলে।

❖ **জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম (Uterine germination) :** উদ্ভিদে থাকা অবস্থায় ফলের অভ্যন্তরে বীজের অঙ্কুরোদগমকে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম বলে। ম্যানগ্রোভ বনের কিছু ।কিছু উদ্ভিদে এ ধরনের অঙ্কুরোদগম দেখা যায়।

❖ **ম্যানগ্রোভ বন (Mangrove forest) :** যে বনাঞ্চলের মৃত্তিকায় লবণ অত্যাধিক এবং সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার প্রভাবে মৃত্তিকা সবসময় ভেজা থাকে। সেই বনকে ম্যানগ্রোভ বন বলে। সুন্দরবন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন।

❖ **সবুজ বেষ্টনী (Green belt) :** উপকূলীয় ভাঙ্গন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার লক্ষে প্রধান বায়ুপ্রবাহের সমকোণে উপকূল বরাবর রোপিত বৃক্ষরাজিকে সবুজ বেষ্টনী বলে।

❖ **হটস্পট (Hotspot) :** জীববৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোকে হটস্পট বলা হয়। ১৯৮৮ সালে নর্মান মায়ার্স হটস্পট শব্দের প্রচলন করেন। বর্তমানে পৃথিবীতে ২৫টি হটস্পট রয়েছে। বাংলাদেশের সমগ্র সিলেট, চট্রগ্রাম ও পার্বত্য চট্রগ্রাম ইন্দোবার্মা হটস্পট-এর অন্তর্ভূক্ত।

❖ **ইন-সিটু সংরক্ষণ (*In-situ* conservation) :** বিপন্নপ্রায় উদ্ভিদ বা প্রাণি যেসব এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে জন্মায় ও তাদের জীবনচক্র সম্পন্ন করে তাদেরকে ঐসমস্ত এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রক্রিয়াকে ইনসিটু সংরক্ষণ বলে।

❖ **এক্স-সিটু সংরক্ষণ (*Ex-situ* conservation) :** কোনো জীবকে তার প্রাকৃতিক আবাসস্থানের বাইরে নিয়ে এসে অন্য কোনো পরিবেশে জন্মানোর মাধ্যমে সংরক্ষণের প্রক্রিয়াকে এক্স-সিটু সংরক্ষণ বলে।

❖ **জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান (National Botanic Garden) :** প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যসহ যেসব স্থানে সব ধরনের গাছপালা ও বন্য জীবজন্তু নিজস্ব পরিবেশে কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত হয় তাদেরকে জাতীয় উদ্যান বা ন্যাশনাল পার্ক বলে।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন (Knowledge Based Questions)

১। প্রজাতি কী?
২। জীবগোষ্ঠী কী?
৩। বায়োমাস কী?
৪। বায়োম কী?
৫। তুন্দ্রা কী?
৬। ম্যানগ্রোভ কী?
৭। মোহনা কী?
৮। এন্ডেমিক প্রাণি কী?
৯। সবুজ বেষ্টনী কী?
১০। অভয়্যরণ্য কী?
১১। ইকোপার্ক কী?
১২। সাফারি পার্ক কী?
১৩। সিড ব্যাংক কী?
১৪। অভিযোজন কী?
১৫। নিউম্যাটোফোর কী?
১৬। ইকোলজিক্যাল পিরামিড কী?
১৭। শক্তির পিরামিড কী?
১৮। প্লাটিপাস কোন প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলের প্রাণি?
১৯। প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল কাকে বলে?
২০। জীববৈচিত্র্য কী?
২১। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কাকে বলে?
২২। ইন-সিটু সংরক্ষণ কী?
২৩। জীবসম্প্রদায় বা কমিউনিটি কী?
২৪। সাভানা কী?
২৫। নিশ কী?
২৬। ইকোসিস্টেম কী?
২৭। বায়োমাস কী?
২৮। নিউম্যাটোফোর কী?
২৯। প্রাণিভূগোল কী?
৩০। মহাদেশীয় সঞ্চারণ কী?
৩১। ওয়ালেস লাইন কী?
৩২। বাংলাদেশ কোন প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলে অবস্থিত?
৩৩। হটস্পট কী?
৩৪। ইন-ভিট্রো সংরক্ষণ কী?
৩৫। বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় একটি উদ্ভিদের নাম লিখ?
৩৬। সিড ব্যাংক কী?
৩৭। প্রজাতিসমূহ ঐশ্বরিক সৃষ্টি বলে মত দেন কে?
৩৮। একটি নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদের নাম লিখ?
৩৯। ইকোসিস্টেমের বৈশ্বিক একক কী?
৪০। কোন বনাঞ্চলের মাটিতে হিউমাস বেশি থাকে?
৪১। উৎপাদক কী?
৪২। খাদক কী?
৪৩। বিয়োজক কী?
৪৪। অভিযোজন কী?
৪৫। বাস্তুতান্ত্রিক একক কী?

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন (Comprehension Based Questions)

১। বায়োটিক কমিউনিটি বলতে কী বুঝ?
২। সংখ্যার পিরামিড বলতে কী বুঝ?
৩। বায়োমাসের পিরামিড বলতে কী বুঝ?
৪। শক্তির পিরামিড বলতে কী বুঝ?
৫। বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহ বলতে কী বুঝ?
৬। জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম বলতে কী বুঝ?
৭। উপকূলীয় সবুজবেষ্টনী সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী?
৮। বিলুপ্ত প্রজাতি বলতে কী বুঝ?
৯। জার্মপ্লাজম ও জার্মপ্লাজম ব্যাংক বরতে কী বুঝ?
১০। ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের উপ-অঞ্চলগুলোর নাম লিখ?
১১। মরুজ উদ্ভিদ কিভাবে প্রকৃতিতে টিকে থাকে?
১২। এন্ডেমিক জীব বলতে কী বুঝ?
১৩। হ্যালোফাইট উদ্ভিদের অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য লিখ?
১৪। এক্স-সিটু সংরক্ষণ বলতে কী বুঝ?
১৫। ম্যানগ্রোভ বন বলতে কী বুঝ?
১৬। বিলুপ্ত প্রায় জীব সংরক্ষণের প্রয়োজন কেন?
১৭। জীব বিলুপ্তির কারণ কী লিখ?
১৮। ইকোসিস্টেমেশক্তি প্রবাহ একমুখী কেন?
১৯। জীবের অভিযোজন বলতে কী বুঝ?
২০। জলজ ও লবণাক্ত পরিবেশে অভিযোজন বলতে কী বুঝ?
২১। প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলসমূহের নাম লিখ?
২২। ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের উপ-অঞ্চলগুলোর নাম লিখ?
২৩। ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের ৩টি এন্ডামিক প্রাণির বৈজ্ঞানিক নাম লিখ?
২৪। বনভুমি একটি বায়োম-ব্যাখ্যা কর?
২৫। ইকোপার্ক বলতে কী বুঝ?
২৬। ইকোট্যুরিজম প্রয়োজন কেন?
২৭। বিলুপ্তপ্রায় জীব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা লিখ?
২৮। জীববৈচিত্র্য বলতে কী বুঝ?
২৯। উদ্ভিদ উদ্যান বলতে কী বুঝ?
৩০। অভয়ারণ্য বলতে কী বুঝ?
৩১। মৎস্য অভয়াশ্রম বলতে কী বুঝ?
৩২। হালদা নদীকে প্রকৃতির মৎস্য খনি বলা হয় কেন?
৩৩। জলজ বায়োম বলতে কী বুঝ?
৩৪। সবুজ বেষ্টনীর জন্য কোন ধরনের বৃক্ষ নির্বাচন করা যায়?
৩৫। রেড ডাটাবুক বলতে কী বুঝ?
৩৬। মুক্ত ভাসমান জলজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য লিখ?
৩৭। চিরহরিৎ অরণ্য বলতে কী বুঝ?
৩৮। মরুভূমি একটি বায়োম- ব্যাখ্যা কর?
৩৯। জলজ বায়োম বলতে কী বুঝ?
৪০। শক্তির পিরামিড বলতে কী বুঝায়?
৪১। মিশ্র জীবগোষ্ঠী বলতে কী
৪২। সাফারি পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য কী?
৪৩। অপসারী অভিযোজন বলতে কী বুঝ?
৪৪। সর্বোচ্চ খাদক বলতে কী বুঝ
৪৫। বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের ৫টি বৈজ্ঞানিক নাম লিখ?

১। ঢাকায় অবস্থিত বোটানিক্যাল গার্ডেনে শিক্ষা সফরে গিয়ে শিক্ষার্থীরা সুন্দরী গাছ দেখতে পেল। শিক্ষক তাদেরকে জানালেন, এটা এক ধরনের সংরক্ষণ পদ্ধতি। তিনি আরও বললেন, জীব সম্প্রদায় রক্ষা না করতে পারলে সার বিশ্ব অচিরেই হুমকির মধ্যে পতিত হবে। *[বরিশাল বোর্ড-২০১৯]*

(ক) প্রজাতি কী? ১
(খ) ইকোলজিক্যাল পিরামিড ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের উল্লিখিত পদ্ধতিটি বর্ণনা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের শেষোক্ত বাক্যটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২। নিচের চিত্র দুটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭]

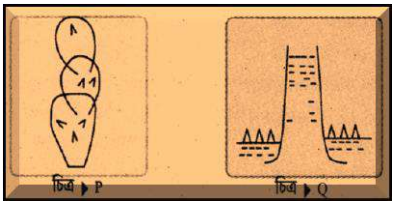

(ক) বাংলাদেশের বিলুপ্ত প্রায় একটি উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ? ১
(খ) উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর জন্য কোন ধরনের বৃক্ষ নির্বাচন করা যায়? ২
(গ) উদ্দীপকের Q উদ্ভিদসমূহ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি উপযুক্ত- কারণ লিখ। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের P এবং Q উদ্ভিদসমূহ ভিন্ন পরিবেশে জন্মালেও এদের মধ্যে অভিযোজনগত সাদৃশ্য বিদ্যামান- ব্যাখ্যা কর। ৪

৩।

(ক) জীবগোষ্ঠী কী? ১
(খ) সংখ্যার পিরামিড বলতে কী বুঝ? ২
(গ) উদ্দীপকের চিত্রের আলোকে সুন্দরবনের একটি খাদ্য শৃঙ্খল ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) ''উদ্দীপকের সর্বোচ্চ খাদক সবচেয়ে কম শক্তি ব্যবহার করে''- বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। ঘাস ⟶ ঘাসফড়িং ⟶ ব্যাঙ ⟶ সাপ ⟶ বাজপাখি
[সিলেট বোর্ড-২০১৬]

(ক) পুষ্প প্রতীক কী? ১
(খ) বায়োম বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকের তথ্য থেকে একটি পরিবেশীয় পিরামিড অঙ্কন কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের প্রতিটি ধাপে উৎস থেকে শক্তির প্রবাহ পরিমাণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬]*

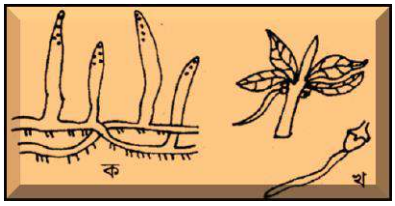

(ক) বাংলাদেশ কোন প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলে অবস্থিত? ১
(খ) প্রজাতি বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) চিত্রে প্রদর্শিত অভিযোজিত বৈশিষ্ট্য দুইটি যে বনের উদ্ভিদে পরিলক্ষিত হয়, সেই বনের তিনটি উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। ৩
(ঘ) চিত্রে প্রদর্শিত 'ক' ও 'খ' অভিযোজিত বৈশিষ্ট্যের কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। *[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৬]*

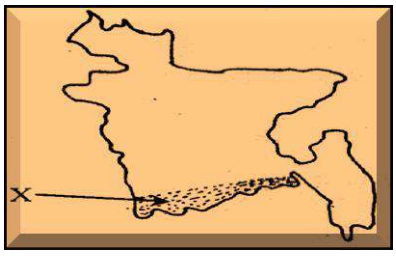

(ক) ইনভিট্রো সংরক্ষণ কী? ১
(খ) বায়োমাস এর পিরামিড বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকে "X" নির্দেশিত এলাকার উদ্ভিদগুলির অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) বাংলাদেশে পরিবেশ রক্ষায় নির্দেশিত অঞ্চলের উদ্ভিদসমূহের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। শিক্ষক আজ শ্রেণিকক্ষের বোর্ডে ২০টি উদ্ভিদের নাম লিখলেন। তিনি ৫টি উদ্ভিদকে লাল দাগ দিয়ে বললেন এগুলো Red List এ আছে। তিনি বললেন বিভিন্ন প্রকার ইকোলজিক্যাল ও মানবসৃষ্ট কারণে জীবের বিলুপ্তি ঘটছে এবং পরিবেশ আজ হুমকীর সম্মুখীন।

(ক) নিউম্যাটোফোর কী? ১
(খ) জীব বিলুপ্তির কারণ কী? ২
(গ) শিক্ষকের দাগ দেওয়া উদ্ভিদগুলো কেন উল্লেখিত Red List এ স্থান পেল? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) জীবের বিলুপ্তিতে উদ্দীপকের কারণ দুটির শেষ কারণটি কী কী হতে পারে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবনের পাশে সিডর বিধ্বস্ত শরণখোলা গ্রাম। গ্রামের মানুষের মধ্যে অনেকদিন ধরে আতঙ্ক বিরাজ করছে। প্রায়ই রাতের বেলা বাঘ এসে তাদের হালের গরু, ছাগল এমনকি মানুষ পর্যন্ত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। গ্রামবাসী রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে কিন্তু বাঘের উপদ্রব দিন দিন বেড়েই চলছে।

(ক) সিড ব্যাংক কী? ১
(খ) মরুভূমি একটি বায়োম-ব্যাখ্যা কর? ২
(গ) কী করণে বাঘ বন ছেড়ে গ্রামে আসে? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) বাঘ যাতে গ্রামে না আসে তার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? ৪

৯। ছাত্রছাত্রীরা জীববিজ্ঞান ক্লাসে শিক্ষকের কাছ থেকে স্থলজ, জলজ ও মরুজ পরিবেশে উদ্ভিদের অভিযোজন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল ও প্রজনন সম্পর্কে জানল।

(ক) ইকোপার্ক কী? ১

(খ) মরুজ উদ্ভিদ কীভাবে প্রকৃতিতে টিকে থাকে? ২

(গ) উদ্দিপকে উল্লিখিত পরিবেশে উদ্ভিদগুলো বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তনের মাধ্যমে টিকে থাকে- ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দিপকে উল্লিখিত জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। রুমানা পরীক্ষা শেষে গ্রামে নানা বাড়ি বেড়াতে এসেছে। গ্রামের খোলামেলা ও সবুজ পরিবেশ দেখে সে অভিভূত হলো। একদিন সে দেখলো পুকুর পাড়ে একটি ব্যাঙ পোকা খাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করলো হঠাৎ একটি বড় মাছ ব্যাঙটিকে গিলে ফেলছে।

(ক) জীববৈচিত্র্য কী? ১

(খ) জলজ ও মরুজ পরিবেশে অভিযোজন বলতে কী বুঝ? ২

(গ) উদ্দিপকে উল্লেখিত জীবদের মধ্যে সম্পর্কের স্থান ভিত্তিক শিকল তৈরি কর। ৩

(ঘ) উদ্দিপকে উল্লেখিত জীবদের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফরে সিলেটের জলাবন "রাতারগুল" এ বন্য গোলাপ দেখে মুগ্ধ হলো। *[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৯]*

(ক) বায়োম কী? ১

(খ) রেড ডাটাবুক বলতে কী বুঝ? ২

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত বনের উদ্ভিদসমূহের অভিযোজনীয় বৈশিষ্ট্য লিখ। ৩

(ঘ) বর্তমানে উদ্দীপক বনের জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন- উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১২। উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের একদল শিক্ষার্থী শিক্ষা সফরে পার্বত্য চট্টগ্রাম যায়। সেখানে তারা কালোগোলাপ, শাপলা, ফনিমনসা, হাইড্রিলা, মস ইত্যাদি উদ্ভিদ সংগ্রহ করে শিক্ষককে দেখায়। শিক্ষক আর এক প্রকার উদ্ভিদ সুন্দরীর কথা বললেন যা সুন্দরবনে পাওয়া যায়।

(ক) প্রাণিভূগোল কী? ১

(খ) উদ্ভিদ উদ্যান বলতে কী বুঝ? ২

(গ) উদ্দীপকের উদ্ভিদগুলো তাদের নিজ বাসস্থানে কীভাবে অভিযোজিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের উদ্ভিদগুলো অন্য বাসস্থানে কীভাবে অভিযোজিত হতে পারে তা ব্যাখ্যা কর। ৪

১৩। ড. রাফিউল সুন্দরবন ভ্রমনে গিয়ে এক ধরনের উদ্ভিদে শ্বাসমূল ও জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম এবং অন্য ধরনের উদ্ভিদে বড় বায়ুকুঠুরী ও লম্বা মধ্যপর্ব দেখতে পেলেন যা উদ্ভিদগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে অভিযোজিত করেছে এবং বনকে একটি আলদা মর্যদা দিয়েছে।

(ক) একটি নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদের নাম লিখ? ১

(খ) মরুভূমি একটি বায়োম- ব্যাখ্যা কর? ২

(গ) উক্ত দুই প্রকার উদ্ভিদের মধ্যে তুলনা কর। ৩

(ঘ) উক্ত উদ্ভিদগুলো কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে টিকে আছে। ৪

১৪। নিচের চিত্রগুলো লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : *[যশোর বোর্ড-২০১৭]*

(ক) বায়োম কাকে বলে? ১

(খ) হ্যালোফাইট উদ্ভিদের অভিযোজনীয় বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের উল্লিখিত 'খ' প্রাণিটি কোন ভৌগোলিক অঞ্চলের, তার বনভূমির ও প্রাণির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' চিত্রটির প্রজনন শৈলীর বৈচিত্র্যতা বন সৃজনে কী ভূমিকা পালন করে- বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্র উপকূলে একটি বিশেষ ধরনের বনভূমি আছে যা বালাদেশকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে এবং একই সাথে এটি বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভূক্ত।

(ক) নিউম্যাটোফোর কী? ১

(খ) ইকোট্যুরিজোম প্রয়োজন কেন? ২

(গ) উদ্দীপকের উদ্ভিদসমূহের অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ। ৩

(ঘ) উক্ত বনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের *Ex-situ*-র চেয়ে *In-situ* সংরক্ষণই উত্তম-যুক্ত দাও। ৪

১৬। তারেক তার বন্ধুদের সাথে শিক্ষা সফরে গিয়েছিল কুমিল্লার ময়নামতিতে। এখানকার বনাঞ্চলের উদ্ভিদের সাথে পরিচিত হওয়ার সময় শিক্ষক বললেন, ইহা একটি বিশেষ ধরনের বনাঞ্চল। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে আরও বিশেষ ধরনের বনাঞ্চল আছে। বাংলাদেশের দক্ষিনাঞ্চলে আরও একটি বিশেষ ধরনের বনাঞ্চল আছে যা বাংলাদেশর ঐতিহ্য। *[রাজশাহী বোর্ড-২০১৫]*

(ক) পুপুলেশন কী? ১

(খ) সাফারি পার্ক বলতে কী বুঝ? ২

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয় বনাঞ্চলের যেকোনো তিনটি উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের উল্লিখিত বনাঞ্চল দুটির তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ৪

১৭। নীলা লেকের পড়ে বসে আছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ে অনেকগুলো ছোট মাছ পানির নিচে কিছু উদ্ভিদকে ঘিরে সাঁতার কাটছে এবং কিছুক্ষণ পরপর ঐ উদ্ভিদগুলোতে ঠোকর দিচ্ছে। অদূরে একটি মাছরাঙা বসে আছে। নীলার বড় বোন শিক্ষা সফরে গিয়ে দেখে একটি পাম জাতীয় গাছের গোড়ায় চারদিকে মাটির উপর সামুদ্রিক কোরালের মতো কিছু ছড়িয়ে আছে। শিক্ষক বললেন, এগুলো এ গাছের মূল। *[সিলেট বোর্ড-২০১৫]*

(ক) রায়োমাস কী? ১

(খ) 'এক্স-সিটু সংরক্ষণ' বলতে কী বুঝ? ২

(গ) নীলার চারপাশর পরিবেশের উপাদানেগুলোর মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যামান শক্তির হিসেব অনুযায়ী তা পিরামিড আকৃতির নকশার সহায্যে দেখাও এবং বিভিন্ন স্তর চিহ্নিত কর। ৩

(ঘ) নীলার বড় বোনের দেখা মূল সৃষ্টির কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

১। কোন দেশটি ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত? *[ঢা. বো. '১৯]*
(ক) কানাডা (খ) ব্রাজিল
(গ) অস্ট্রেলিয়া (ঘ) শ্রীলঙ্কা

২। ইকোসিস্টেমে শক্তির প্রবাহ কয়টি পর্যায়ভূক্ত? *[সকল বোর্ড-১৮]*
(ক) ২ (খ) ৩
(গ) ৪ (ঘ) ৫

৩। শাপলা কোন ধরণের উদ্ভিদ? *[রা. বো. '১৬]*
(ক) জেরোফাইট (খ) হ্যালোফাইট
(গ)হাইড্রোফাইট (ঘ) মেসোফাইট

৪। কোনটি বাংলাদেশের একমাত্র গেম রিজার্ভ? *[সি. বো. '১৫]*
(ক) রামসাগর (খ) ডুলাহাজরা
(গ) টেকনাফ (ঘ) মাধবকুণ্ড

চিত্র থেকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও : *[দি. বো. '১৭]*

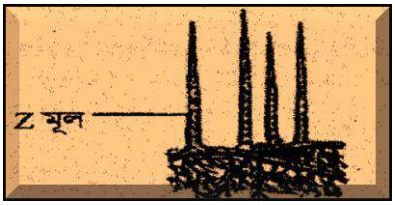

৫। Z মূলটি পরিলক্ষিত হয় কোন উদ্ভিদে?
(ক) মরুজ (খ) সকল জলজ
(গ) লবণাক্ত (ঘ) আর্দ্রমৃত্তিকার

৬। Z মূলটি সহায়তা করে উদ্ভদের-
i. প্রস্বেদনে
ii. সালোকসংশ্লেষণে
iii. O_2 পরিবহনে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii*
(গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

৭। কোনটি *In-situ* সংরক্ষণ? *[ঢা. বো. '১৭]*
(ক) ইকোপার্ক (খ) বোটানিক্যাল গার্ডেন
(গ) বীজ ব্যাংক (ঘ) চিড়িয়াখানা

৮। কোনটির নাম প্রকাশের জন্য দ্বিপদ নামকরণ প্রথা ব্যবহার করা হয়?
(ক) প্রজাতি (খ) গোত্র
(গ)বর্গ (ঘ) গণ

৯। কোনটি মুক্ত ও নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ?
(ক) ঝাঁঝি (খ) হাইড্রিলা
(গ) পদ্ম (ঘ) পানি মরিচ

১০। বট কোন ধরনের বায়োমের উদ্ভিদ?
(ক) পত্রঝরা বনভূমি (খ) তৃণভূমি
(গ) গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মৌসুমী অরণ্য (ঘ) ম্যানগ্রোভ বনভূমি

১১। কোনটি পত্রঝরা বনের উদ্ভিদ? *[সি. বো. '১৬]*
(ক) *Heritiera fomes* (খ) *Sonneatia apetela*
(গ) *Excoecaria agallocha* (ঘ) *Shorea robusta*

১২। চিরহরিৎ বনাঞ্চলের উদ্ভিদ কোনটি?
(ক) *Dipterocarpus turbinatus* (খ)*Acacia nilotica*
(গ) *Tectona grandis* (ঘ) *Albizia procera*

১৩। সুন্দরী গাছের বৈজ্ঞানিক নাম কি? *[চ. বো. '১৬]*
(ক) *Excoecaria agallocha* (খ) *Nipa fruticans*
(গ) *Heritiera fomes* (ঘ) *Acanthus ilicifolius*

১৪। *Ex-Situ* সংরক্ষণ হলো- *[দি. বো. '১৭]*
i. বোটানিক্যাল গার্ডেন
ii. সীড ব্যাংক
iii. সাফারি পার্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii*
(গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

১৫। লোনা মাটির অধিকাংশ প্রজাতির পাতা-
i. পুরু *ii.* পাতলা
iii. মাংসল
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii*
(গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

১৬। হ্রদের প্রোফান্ডাল অঞ্চলে-
i. পানি ঠান্ডা ও বেশি ঘন
ii. প্রাণগুলো পরজীবী প্রকৃতির
iii. প্রাণীগুলো পরভোজী প্রকৃতির
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii*
(গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

১৭। কোনটি বাংলাদেশের বিলুপ্ত প্রাণী?
(ক) পাতিকাক (খ) ঘড়িয়াল
(গ) মেনিমাছ (ঘ) ঘুইল্যা টেংরা

📖 উদ্দীপকের পড়ে ২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাংলাদেশের সব জায়গার মাটি ও আবহাওয়া এক রকম নয়। তাই এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম উদ্ভিদ জন্মায়। কোনো কোনো উদ্ভিদ চিরহরিৎ আবার কোনো কোনটি পত্রঝরা। শাল, চাপালিশ, নলখাগড়া, সুন্দরী, গেওয়া, বান্দরহোলো, গোলাপাতা ইত্যাদি বিভিন্ন পরিবেশে জন্মে থাকে।

১৮। উদ্দীপকের পত্রঝরা উদ্ভিদ কোন অঞ্চলে বেশি জন্মে থাকে?
(ক) গঙ্গানদীর বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চলে
(খ) ঢাকা-ময়মনসিংহ বনাঞ্চলে
(গ) বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে
(ঘ) চট্রগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে

১৯। উদ্দীপকের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদগুলোর বৈশিষ্ট্য-
i. জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম
ii. শ্বাসমূল উপস্থিত
iii. লুকায়িত পত্ররন্ধ্র উপস্থিত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii*
(গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

📖 চিত্র থেকে ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

২০। উপরোক্ত উদ্ভিদটি কোন মাটিতে জন্মায়?
(ক) আর্দ্র (খ) শুষ্ক
(গ) এটেল (ঘ) দোআঁশ

২১। উদ্ভিদটির বৈশিষ্ট্য-
i. মূল মূলত্রবিহীন
ii. কাণ্ড খর্বাকার
iii. পাতা শল্ক জাতীয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii*
(গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

২২। হটস্পট হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়-
(ক) জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অঞ্চলকে (খ) তুন্দ্রা অঞ্চলকে
(গ) জাতীয় উদ্যানকে (ঘ) ইকোপার্ককে

২৩। কিসের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীকে মোট ৬টি প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে?
i. মেরুদন্ডী প্রাণিদের অবস্থান
ii. মেরুদন্ডী প্রাণিদের বিস্তৃতি
iii. মেরুদন্ডু প্রাণিদের সংখ্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii*
(গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

২৪। মাধবকুণ্ড একটি- *[রা. বো. '১৭]*
(ক) গেম রিজার্ভ (খ) সাফারি পার্ক
(গ) ইকোপার্ক গ. অভয়ারণ্য

২৫। *Ex-situ* conservation-এর উদাহরণ হলো- *[য. বো. '১৭]*
(ক) চিড়িয়াখানা (খ) অভয়ারণ্য
(গ) সাফারি পার্ক (ঘ) ইকোপার্ক

২৬। বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ কোনটি? *[য. বো. '১৬]*
(ক) তালি পাম (খ) সুন্দরী
(গ) আম (ঘ) লিচু

২৭। *Ex-situ* conservation-এর উদাহরণ কোনটি?
(ক) উদ্ভিদ উদ্যান (খ) ইকোপার্ক
(গ) অভয়ারণ্য (ঘ) সাফারি পার্ক

২৮। কোনটি ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের এন্ডেমিক প্রাণি? *[কু. বো. '১৫]*
(ক) ব্লাকফিশ (খ) প্লাটিপাস
(গ) সবুজ রুই (ঘ) লেমুর

২৯। কোনটি ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ? *[ব. বো. '১৫]*
(ক) শাল (খ) গোলপাতা
(গ) খেজুর (ঘ) নাগেশ্বর

৩০। বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ হলো- *[ঢা. বো. '১৫]*
i. Corypha taliera
ii. Knema baenalensis
iii. Sharea robusta
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii*
(গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

৩১। বাংলাদেশ কোন প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলে অবস্থিত? *[মেডিকেল : '০৪-০৫]*
(ক) প্যালিআর্কটিক অঞ্চল (খ) ওরিয়েন্টাল অঞ্চল
(গ) নিওট্রপিক্যাল অঞ্চল (ঘ) ইথিওপিয়ান অঞ্চল

📖 নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
খুলনা, পটুয়াখালী ও সাতক্ষীরা কিছু এলাকা নিয়ে প্রায় ০.৬১ হেক্টর বনভূমি গঠিত। এ অঞ্চলের উদ্ভিদ প্রজাতিগুলো জোয়ার-ভাটায় অভিযোজিত হয়েছে। এরা অন্য এলাকায় জীবনধারণ করতে পারে না।

৩২। উক্ত এলাকার উদ্ভিদগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো- *[দি. বো. '১৫]*
i. মাটি সবসময় কর্দমাক্ত থাকে
ii. এদের পাতাগুলো মসৃণ ও চকচকে দেখায়
iii. কাণ্ডের নিম্নভাবে ঠেস মূল উৎপন্ন হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) *i* ও *ii* (খ) *i* ও *iii*
(গ) *ii* ও *iii* (ঘ) *i, ii* ও *iii*

৩৩। শক্তি পিরামিডে সবচেয়ে কম শক্তি ব্যবহার করে নিম্নে উল্লিখিত কোনটি? *[ডেন্টাল : '০৮-০৯]*
(ক) টারশিয়ারি খাদক (খ) উৎপাদক
(গ) প্রাইমারি খাদক (ঘ) সেকেন্ডারি খাদক

📖 সঠিক উত্তর : অনুশীলনী-১২ 📖

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ঘ	খ	গ	গ	গ	খ	ক	ক	ক	গ	ঘ	ক	গ	ক	খ	খ	খ	খ	ক	খ
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	*	*	*	*	*	*	*
গ	ক	ক	গ	ক	ক	ক	গ	খ	ক	খ	ঘ	ক	*	*	*	*	*	*	*